নকশাল আন্দোলনের জেলস্মৃতি আলেখ্য : একটি সময়ের ইতিবৃত্ত

এম.ফিল. (বাংলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক : মনোরমা রুজ

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক শম্পা চৌধুরী

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭- ২০১৯

ক্রমিক সংখ্যা : ০০১৭০০১০৩০১৯

পরীক্ষা ক্রমিক সংখ্যা : MPBE194017

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : 142358 of 2017-2018

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

মুখবন্ধ

খুব ছোটো বেলায় বাড়িতে ‘নকশাল’ শব্দটা খুব শুনতাম। কিন্তু সেই বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে ‘নকশাল কী’?- এই প্রশ্নটা বার বার আঘাত করত। পরবর্তীকালে পড়াশোনার সাথে সাথে নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানতে পারি। এর পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. প্রথম বর্ষে স্পেশাল প্যাপারের ক্লাস করতে গিয়ে নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠি। যদিও এই আগ্রহের পিছনে বরেন্দু স্যারের বিশেষ ভূমিকা কাজ করে। তাঁর অনুপ্রেরণায় আমি নকশাল আন্দোলনের জেলস্মৃতি নিয়ে কাজ করার কথা ভাবতে শুরু করি। পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ইতিহাসকে আমাদের কাছে তথ্যে সাজিয়ে দিয়েছিলেন অধ্যাপক শম্পা চৌধুরী। তাঁর সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ আমার গবেষণাকে সঠিক পথে চালিত করেছে। তাই তাঁর ঋণ অনস্বীকার্য। সাতের দশকে সাধারণ মানুষের মননে ও চিন্তনে নকশালবাড়ি আন্দোলন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ফলে দেশের আপামর জনসাধারণ উদ্বুদ্ধ হয়ে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই সময়ে এই আন্দোলনের কারণে বহু মানুষ জেলে যায়। পরবর্তীকালে বেশ কিছু মানুষ জেলজীবনের নারকীয় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন তাঁদের স্মৃতিকথায়। এই জেলস্মৃতিগুলি আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাই এই স্মৃতিকথাগুলির দর্পণে স্বাধীন দেশের বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকটিকে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি।

এছাড়া এই গবেষণায় মূল্যবান মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস। যাঁরা আমার গবেষণার কাজে নিজেদের মূল্যবান বয়ান দিয়ে গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করেছে, তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক, বিভাগীয় দাদা-দিদি এবং সহপাঠীদের থেকে গবেষণার কাজে বিভিন্নভাবে সাহায্য পেয়েছি। সর্বোপরি, আমার বাবা, মা এবং পরিবারের

অন্যান্যরা গবেষণার কাজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমার ঋণ।

সূচিপত্র

ভূমিকা **১-৬**

প্রথম অধ্যায় **৭-২৪**

নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক পটভূমি

দ্বিতীয় অধ্যায় **২৫-৫৯**

অত্যাচারিতের বয়ান

তৃতীয় অধ্যায় **৬০-৯৮**

জেলস্মৃতি : আন্দোলনের রূপরেখা

চতুর্থ অধ্যায় **৯৯-১১৪**

জেলস্মৃতি : স্বতন্ত্র সাহিত্য হিসেবে মূল্যায়ন

উপসংহার **১১৫-১১৯**

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি **১২১-১২৮**

স্মৃতিকথন **১২৯-১৬০**

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাসে নকশালবাদী রাজনীতি এবং আন্দোলন নানা কারণে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষককে বঞ্চনার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার সংকল্প নিয়ে ১৯৬৭-র মার্চ মাসে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া তিনটি থানার অঞ্চলে যে আন্দোলনের সূত্রপাত তা অচিরেই ছড়িয়ে পড়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের এই রাজনীতি কার্যত এযাবৎকালের লালিত সমাজ সম্পর্কিত সমস্ত প্রকার চিন্তাচর্চার মূল ধরে নাড়া দিল। এই আন্দোলন যেমন একদিকে এদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর রাজনীতিক কর্মকান্ড এবং সংসদীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল, তেমনি শহরের ছাত্র-যুবক বুদ্ধিজীবীদের এক বিশাল অংশকে যুক্ত করতে পেরেছিল কৃষক আন্দোলনের অংশভাগ হিসেবে। নকশালবাড়ি আন্দোলন যত প্রবল হল, তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রবল হয়ে উঠল প্রশাসনের দমননীতি। এই দমননীতির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চেহারাটা হয়তো ধরা পড়েছে জেলখানার অভ্যন্তরে। পশ্চিমবাংলায় সব জেলখানায় আন্দোলন কর্মীদের আটকে রাখা হয়েছিল। রাষ্ট্র আইন দেখিয়ে, আইন বানিয়ে, আইন না মেনে, আইন ভেঙে সব ধরনের অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার করে গিয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। জেলের ভেতর থেকে বন্দিদের লেখা চিঠি, ডায়েরি তার যথেষ্ট প্রমাণ। একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক শাসনের দেশে রাষ্ট্র একদল নাগরিককে রাজনীতিক আন্দোলন করার জন্য তাদের সঙ্গে যে নির্মম আচরণ করেছে, তার প্রমাণ হিসেবে জেলস্মৃতিগুলোর পর্যালোচনা একটি বিশেষ অনুসন্ধানের দাবি রাখে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্য ব্যবস্থার গোড়াপত্তনের সেই সুপ্রাচীনকালের ইতিহাস থেকে আজ অবধি কারাগারই অপরাধী সংশোধনের নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী 'রাজনৈতিক' বন্দির তাৎপর্য হল যে, রাজনৈতিক প্রকৃতির 'অপরাধ'-এর জন্য কোনো ব্যক্তিকে বন্দি করা হয়েছে। এখানে 'রাজনৈতিক' এবং 'অপরাধ' এই দুটি শব্দকে দুটি

ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থে নিজের মত করে ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা যে সমস্ত কাজ করেন, রাষ্ট্র সেগুলির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে সেগুলিকে অপরাধ বলে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে বিদ্রোহীরা তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে তুলে ধরে সেই কাজগুলিকেই নায্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন এবং এই কাজগুলিকে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক সংগ্রামের অঙ্গ বলে মনে করেন। জেল জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। কিন্ত তৎকালীন সরকারের চোখে অপরাধী এবং অধিকাংশই রাজনীতিজ্ঞ বা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত। বাংলা ভাষায় রচিত এই অভূতপূর্ব জেলসাহিত্য গোটা বিশ্বের অনাগতকালের মুক্তিকামী মানুষের জন্য যে কী অপূর্ব মানিকরতন, সে উপলব্ধি থাকতে পারে কেবল এর হৃদয়গ্রাহী পাঠকেরই।

সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য আর্থ-সামাজিক ও আইনি কাঠামো বিরোধী সকল শক্তিকে দমন, পীড়ন এবং অবশেষে বশ্যতা স্বীকারের জন্য আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা জেলকে এক অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্ত সাতের দশকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বন্দির সংখ্যার বিচারেই নয়, জেল সেই সময় হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক বিদ্রোহের এক সক্রিয় কেন্দ্র। জেলবন্দি নকশালরা ছিলেন রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং স্বভাবতই জেলের মধ্যে এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলাই ছিল তাঁদের জীবনের প্রধান অঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে সাতের দশকে যদিও বহু শিক্ষিত, মননশীল নকশাল নেতা ও কর্মী জেলবন্দি হয়েছিলেন তবুও জেলের অন্দরমহল সম্পর্কে তাঁদের লিখিত প্রতিবেদনের সংখ্যা কম। যে সামান্য কয়েকজনের জেল অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে, সেইগুলি নিম্নরূপ : আজিজুল হকের *কারাগারে ১৮ বছর,* জয়া মিত্রের *হন্যমান,* মীনাক্ষী সেনের *জেলের ভেতর জেল (পাগলবাড়ি পর্ব),* মলয়া ঘোষের *লালবাজারে ৬৪ দিন,* অজিত চক্রবর্তীর *জেলের গারদে জীবনের গান,* সন্তোষ রাণার *রাজনীতির এক জীবন* ইত্যাদি।

নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে বিস্তর লেখাপড়া-চর্চা-বাদানুবাদ হয়েছে, এখনও হচ্ছে, আগামীতেও হবে। পাশাপাশি নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা সাহিত্যগুলিকে নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা-বিশ্লেষণ তথা গবেষণা হয়েছে। এছাড়া নকশাল আন্দোলনের সময় যারা জেলের ভেতরে ছিলেন, তাঁদের লেখা চিঠি, ডায়েরি, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে নতুন নতুন মাপকাঠির বিচারে। অন্যান্য সমালোচক বা গবেষকদের লেখায় নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যগুলি এসেছে ও আলোচিত হয়েছে, কিন্তু সেই সময়ের জেলের অভ্যন্তরের কথা এসেছে খুব সীমিত।

ষাট-সত্তরের বাংলায় উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি এলাকায় জমিতে কৃষকের অধিকার রক্ষার দাবিকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যে সব শ্রেণির মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শের পেক্ষাপটে অগণিত মানুষ সেদিন তাঁদের প্রচেষ্টার যথার্থ মূল্য পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সময়ের দাবিতে সেই স্বপ্ন প্রসারিত হয়েছিল জীবনের আঙিনায়। শুধুমাত্র কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা নয়, যেখানে কর্তৃত্বের কাছে মাথা নত করার প্রশ্ন সেখানেই নকশালবাড়ি আন্দোলনের অবদান স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। নকশালবাড়ি আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তারা উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি ও তৎসংলগ্ন এলাকার বেশ কিছু স্থানীয় বাসিন্দা। নকশালবাড়ির ভাবাদর্শ খুব সহজেই ছাত্র-যুবকদের স্পর্শ করেছিল কারণ তাতে এক ধরনের অদম্য সাহস এর আহ্বান ছিল। এজন্য বাংলায় গ্রামের আদিবাসী কৃষক, শ্রমিক ছাড়াও কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গার অনেক যুবক-যুবতী নিজেদের পারিবারিক ঘেরাটোপকে অতিক্রম করে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। নকশালবাড়ি আন্দোলন কৃষক আন্দোলন বলে শুরু হলেও আসলে তা ছাত্র ও নাগরিকদের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এই আন্দোলনের পটভূমিকায় বেশ কিছু মানুষ জেলের ভেতরে বন্দি হলেন এবং অত্যাচারিত হলেন। এই সময়ের রাজনৈতিক কর্মীদের লেখায় রাজনীতি এবং রাজনীতি করার জন্য পুলিশি নির্যাতন থেকে শুরু করে জেলবাস- সব

কিছুই লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাই তাঁদের লেখায় বেশ কিছু স্মৃতি উঠে আসে। এই স্মৃতিকথাগুলিতে সেই সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

বস্তুতপক্ষে, স্মৃতিকথা বলতে যে সাহিত্যের কথা বলতে চাইছি, সেই সাহিত্যিক কথাগুলির দুটি গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। একটি হল, বাংলা আত্মজীবনীমূলক সাহিত্যের খন্ডিত উপকরণ হিসেবে এগুলির মূল্য এবং অন্যটি হল, স্বাধীন দেশে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জেলব্যবস্থা সম্পর্কে দেশের নাগরিকের অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়ার বিবরণ। জেলজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে যাঁরা গ্রন্থ লিখেছেন তাদের কেউই তথাকথিত সাহিত্যিক নন, তাঁরা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। দণ্ডিত জীবনের নিষ্ঠুর করুণ অভিজ্ঞতাই সাময়িকভাবে তাঁদের আত্মপ্রকাশে উন্মুখ সাহিত্যকার করে তুলেছিল। সেই বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, অপরিমার্জিত, অপরিশীলিত উপাদানই আমাদের আলোচনার উপকরণ। সুতরাং এই রচনাগুলির ভেতর দিয়ে অনেকেরই জীবন্ত হৃদয়ের উষ্ণতা ও অনুভবকে উপলব্ধি করতে পারব। জেলজীবনের বিবরণ দিতে গিয়ে অনিবার্যভাবে ঘুরেফিরে দেখা দিয়েছে জেলখানার ভৌগলিক রূপ এবং জেলজীবনের তথাকথিত নীতিবোধের দিকটি। বর্তমান আলোচনায় এক বিশেষ কালপর্বের মধ্যে যাঁরা জেলে গিয়েছিলেন তাঁদের লিখিত গ্রন্থগুলি আলোচনার কাজে গ্রহণ করেছি।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের জেলস্মৃতিকে কেন্দ্র করে লেখা বাংলা সাহিত্যগুলি একটি বিশেষ সময়ের সাহিত্যসাধনা। জেলের অভ্যন্তরে বন্দি আন্দোলনকর্মীরা নিজেদের মননশীলতার মাধ্যমে মানুষের কথাই তুলে ধরেছেন তাঁদের শিল্পকর্মে। পাশাপাশি সহবন্দিদের দুঃখ-কষ্ট, ভয়-আতঙ্ক, অত্যাচার ইত্যাদি সাহিত্যিকদের শিল্পকর্মে উঠে আসে সচেতনভাবে। এছাড়া জেলস্মৃতিকথায় রাজনীতির অনুষঙ্গ, কর্মীদের মতাদর্শ, মতানৈক্য ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। নকশালবাড়ি আন্দোলনে এদেশের মেয়েরা রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রত্যক্ষ আন্দোলনকারী ব্যতীত

বেশ কিছু নারীর কথা নকশালকর্মীদের স্মৃতিচারণায় ব্যক্ত হয়েছে, যাঁরা পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে যোগদান করেছিলেন। নকশাল আন্দোলনে যোগদানকারী নাগরিক মহিলারা পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় থানার লক-আপে ধর্ষণ, কষাঘাত, লাথি, লাঠির প্রহার ইত্যাদি চলত সমানভাবে। এই সময় যাঁরা অত্যাচারিত হয়েছেন তাঁদের চোখে আন্দোলনের ইতিহাস এবং অত্যাচারের ইতিহাস জেলস্মৃতিগুলিকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে, তার ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিপ্লবীরা যে আদর্শ নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং জেলের ভেতরে গিয়েছিলেন সেই আদর্শের ধারণা আত্মজীবনীগুলিকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আত্মজীবনীমূলক রচনা হিসেবে যে জেলস্মৃতিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বিদ্যমান। ঐতিহাসিক মূল্যের পাশাপাশি সাহিত্যমূল্য হিসাবে তাঁরা রাষ্ট্র, শক্তি এবং কেন্দ্রের পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চিন্তা, পারিবারিক দৃষ্টান্ত বা শৃঙ্খলার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফলে স্মৃতিকথাগুলিতে তাঁরা নতুন পথের ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই স্মৃতিকথাগুলিতে বিকল্প চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে।

পরিশিষ্টে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ নকশালকর্মীর স্মৃতিকথনের বয়ানে সেই সময়ে যাপিত অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ বিপ্লবী সেই সময়ে জেলবাস করেছেন এবং আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। সরাসরি জেলবাস করেননি এমন একজন কর্মীও তাঁর অভিজ্ঞতাকে বলেছেন। পাশাপাশি নকশালবাড়ি আন্দোলনে মেয়েদের যথার্থ অবস্থান ঠিক কী রকম ছিল, কীভাবে সেই ভূমিকার মূল্যায়ন হয়েছে, সে বিষয়ে কথা বলেছেন।

সাতের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার স্বপ্ন বুকে নিয়ে লড়াই চালিয়ে গেছেন মুক্তিকামী মানুষেরা। তাঁরা লড়েছেন এবং রাষ্ট্রের হাতে বন্দি হয়ে গেছেন জেলখানায়। সত্তরের

জেলখানার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা স্মৃতিকথাগুলি থেকে সেই সময়ের জেলখানার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। সুতরাং স্মৃতিকথাগুলি সেই সময়ের নিরীখে সাহিত্য ও দলিল স্বরূপ হয়ে উঠেছে।

প্রথম অধ্যায়

নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক পটভূমি

নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক পটভূমি

স্বাধীনতার পর থেকে মধ্যবিত্ত মানুষের মনে নানান কারণে হতাশা, ক্ষোভ জন্ম নিয়েছিল আর তারই বিস্ফোরণ ঘটল নকশালবাড়ি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। 'নকশালবাড়ি' ভারতবর্ষের মানচিত্রে প্রায় নাম না জানা ছোট একটি ভূখণ্ড। কিন্তু আন্দোলন পরবর্তী সময়ে নকশালবাড়ি একটা আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেছে এবং একটা স্থাননাম কালক্রমে একটা আন্দোলনের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। "একটা আন্দোলন, একটা বড় রাজনীতিক আন্দোলন, শুধু সেই আন্দোলনের ভাবনাচিন্তা, তত্ত্ব, কাজকর্মের মধ্যেই আটকে থাকে না। এপাশে-ওপাশে ঢেউ তোলে, প্রশ্ন জাগায়, উত্তর খুঁজতে উসকে দেয়। বদলে দেয়, নতুন কিছু আনে। ভাবনায়, কাজে।"[১] সত্তরের দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলন সেইরকমই দাবি করে। এতদিনকার প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি, প্রচলিত চিন্তা চর্চার ভিত্তিভূমিতে আঘাত হানে নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম। 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম'- এই আওয়াজে উত্তাল হয়ে ওঠে দেশের যৌবন, মথিত হয় পরিবর্তনকামী মানুষের হৃদয়। "বিপ্লবের যে কোনও প্রচেষ্টাই মানুষের মনে এক কালান্তরের সূচনা করে; তার কারণ তা শুধু এক রাজনৈতিক কার্যকলাপ নয়, এক সন্ত্রাসমূলক বা বলপ্রয়োগের কাজ নয়। তার চরিত্র হল মূলত সামাজিক, প্রাথমিকভাবে সার্বিক। সমাজের সব দিকে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, মানসজগৎ তথা কৃষ্টি সংস্কৃতি সব দিক দিয়ে বর্তমান অচলায়তন ভেঙে ফেলার উদ্যমের মাঝে বিপ্লবের পদধ্বনি।"[২] আসলে দেশের রাজনীতিতে ষাটের দশকের স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে। দেশের স্বাধীনতাকে ঘিরে মানুষের যে বিপুল প্রত্যাশা ছিল, সুখী সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্ন ছিল- সেইসব স্বপ্নকে স্বাধীনতা তার ঈপ্সিত ফল দিতে পারেনি। এই স্বপ্নভঙ্গের অনিবার্য ফল হিসেবে শুরু হয় বিকল্প সন্ধান, যার আঘাতে ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভেঙে পড়ে কংগ্রেসি আধিপত্য। তখন আমাদের রাজ্যে বিকল্প হিসেবে বামপন্থীরা উঠে আসে। বামপন্থীদের কাজে সশস্ত্র পথের আকর্ষণ ছিল প্রবল। স্বাভাবিক ভাবেই নকশালবাড়ির সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আবেদন বিশেষ করে ছাত্র-যুবকের

কাছে হয়ে উঠে আসে বিকল্প হিসেবে। ফলে দেশের ও রাজ্যের রাজনীতির এই বিকল্প থেকে বিচ্ছিন্ন করে নকশালবাড়ি আন্দোলনের মূল্যায়ন করা যায় না।

সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় সমাজে আলোড়নকারী সংগ্রামের ইতিহাস হল মূলত কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস। এই কৃষক-জনগণের সংগ্রামী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করে। কৃষক আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণীর আন্দোলন ও নেতৃত্বাধীন ভূমিকার মধ্য দিয়ে সামাজিক উৎপাদন ক্রিয়ার বিকাশ ঘটত এবং তার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় অঞ্চলেও গড়ে উঠত এক বা একাধিক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজ এবং রাষ্ট্র। কিন্তু ভারতীয় অঞ্চল ব্রিটিশ উপনিবেশে রূপান্তরিত হওয়ায়, ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক শক্তি ও সামন্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত কৃষক সংগ্রামই হয়ে উঠল সমাজের চালিকা শক্তি তথা সমাজবদলের মূল ভিত্তি। উপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন এর আগে এই কৃষক সংগ্রাম একটা অন্য বিপ্লবী মাত্রা অর্জন করতে থাকে এবং ব্রিটিশ চলে যাবার পরও তার রেশ থাকে। বিশেষত, তেভাগা আন্দোলন ও তেলেঙ্গানার সংগ্রাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর এই কৃষক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় সাতের দশকে গড়ে ওঠে নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম। নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম কেবল ভারতীয় সমাজের আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রকেই তুলে ধরেনি। কৃষক সংগ্রাম ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের প্রতি সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপকেও উন্মোচিত করেছে।

ভারত-নেপাল-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন দার্জিলিং জেলার ছোট একটি অঞ্চলের নাম নকশালবাড়ি। নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া তিনটি থানার ২৭৪ বর্গমাইল মিলে জনসংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লক্ষ জোতদার, মহাজন, দালাল আর চা বাগানের মালিকদের ইংরেজ আমল থেকেই অন্নসংস্থানের জন্য খেটে যাওয়া এখানকার মানুষেরা। নকশালবাড়ি এলাকায় পশ্চিম

দিকে ছিল নেপাল এবং পূর্ব দিকে ছিল বাংলাদেশ। এখানকার কৃষকেরা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন এবং তেভাগা আন্দোলনের সময় থেকেই ধীরে ধীরে জোটবদ্ধ হতে থাকে। সুনীতি কুমার ঘোষ পরবর্তীকালে লিখেছেন : "হিমালয়ের পাদদেশে দার্জিলিং জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তের কয়েকটি গ্রামের গুচ্ছ ঘিরে ১৯৬৭-তে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে, যা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বাঁকের সূচনা করে। ঘটনাটি ছিল নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংসদ মুখে যে স্থূল এবং নির্বোধ অনুশীলন চলছিল তা প্রত্যাখ্যান করে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্তটি এক বিশাল বৈপ্লবিক তাৎপর্য বহন করে এনেছিল। নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম একটি মৌলিক প্রশ্নের নিরসন করে – শ্রেণীর সমঝোতা এবং আত্মসমর্পণের পথ গ্রহণ করে ক্ষমতা দখল করা হবে, নাকি তা করা হবে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে।"[৩] নকশালবাড়ি ছিল উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে প্রথম গণ-বিদ্রোহ। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব স্তরে নতুন ভাবনা, নতুন সৃষ্টির প্রেরণা তৈরি করেছিল নকশালবাড়ি আন্দোলন। ফলে "চলমান অভ্যস্ত রাজনীতির পাশাপাশি উঠে এল আরেক রাজনীতি। সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল।"[৪] ইতিমধ্যে নকশালবাড়ির কৃষকরা উচ্ছেদ বন্ধের জন্য জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছে। ১৯৬৭ সালে ২০ মে থেকে ২২ মে নকশালবাড়ির প্রসাদজোতের বেনামী জমি মিছিল করে দখল করে নেয় কৃষক সমিতি। উল্লেখ্য তখন জমির বেনামী দখলদারী জোতদাররা ছিল বাংলা কংগ্রেসের মদতপুষ্ট। ২৪ মে পুলিশ ও সংগ্রামরত কৃষক জনসাধারণের সংঘর্ষে তীরের আঘাতে পুলিশের একজন সাব ইন্সপেক্টার সোনম ওয়াংদি নিহত হন। ১৯৬৭ সালের ২৫ মে-র ঘটনা নকশালবাড়িকে রাজনীতির প্রতীক হিসেবে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করা হল। "২৫ শে মে প্রসাদজোতে মহিলা সমাবেশ ডাকা হয়েছিল আন্দোলনের কথা বলার জন্য। সেই সমাবেশের নেতা বেভাইজোতর প্রহ্লাদ সিং। এখানে পুলিশ হঠাৎ করে গুলি চালায়। ১১ জন নিহত হন। তার মধ্যে ৭ জন মহিলা ও ২ টি শিশু। একটি শিশু ছিল প্রহ্লাদ

সিংয়ের স্ত্রীর পিঠে বাঁধা অবস্থায়। রাইফেলের গুলি প্রহ্লাদের স্ত্রীর ধলেশ্বরী দেবীর বুক ভেদ করে পিঠের বাচ্চাটিকেও খুন করে।”[৫]

আজ থেকে বহু বছর আগে ইংরেজ আমলে গড়ে উঠেছিল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন। এর পর গঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টি (১৯২০ বা মতান্তরে ১৯২৫ সাল)। ১৯৬৪ সালে মূল কমিউনিস্ট পার্টি সি. পি. আই ভেঙে দু'ভাগ হল সি. পি. আই ও সি. পি. আই (এম)। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ; ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলন আর ১৯৬৭ সালে মার্চ মাসে ভারতবর্ষের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের একচেটিয়া কুড়ি বছরের রাজত্বের অবসানে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আবির্ভাব। নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি মাইলফলক। প্রকৃতপক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দুই ধারার অর্থাৎ বিপ্লবী ও সংশোধনবাদী ধারার মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাসই হল নকশালবাড়ি সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৬৭ সালের মে মাসে উত্তর-বাংলার নকশালবাড়ি অঞ্চলের ধনী জোতদার ও চা-বাগানের মালিকদের বিরুদ্ধে উদ্বৃত্ত জমি দখলের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয় সি. পি. আই (এম)-এর বামপন্থী অংশ। আপাতভাবে দেখা যায় বামপন্থীরা প্রায় সকলেই ছিলেন বিপ্লবকামী এবং আমূল পরিবর্তনকামী। শ্রেণি-সমঝোতার বিরোধী, সংসদ কেন্দ্রিকতার বিরোধী, সংগ্রামমুখী রাজনীতির আধার হিসাবে সি. পি. আই (এম) নিজেকে তুলে ধরেছে। সংশোধনবাদ বিরোধী কর্মসূচিও গৃহীত হয় এই দলে।

সি. পি. আই. ধীরে ধীরে দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত হয়। একদিকে রয়েছে দক্ষিণপন্থী অংশ, যেখানে সর্বভারতীয় নেতারা রয়েছেন। তারা নির্বাচনকেন্দ্রিক, সংসদমুখী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। অন্যদিকে বামপন্থী অংশের নেতৃত্বে ছিলেন সি. পি. আই (এম) দলের নেতৃবর্গ- পি.সি. সুন্দরাইয়া, এ.কে.গোপালন, হর কিসান সিং, জ্যোতি বসু প্রমুখেরা। ভবিষ্যৎ নকশালপন্থীরা হলেন এই দলের অনুগামী; যথা- চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, সুনীতি কুমার ঘোষ, সৌরেন

বসু, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখেরা। এঁরা চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও মাও-সে-তুঙের বিপ্লবকেন্দ্রিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওঠেন। ফলে সি.পি.আই.-এর বামপন্থী অংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় দুটি ধারা; যথা- ১. আগামী দিনের সি. পি. আই (এম), ২. ভাবীকালের নকশালবাড়ি। যাঁরা সি.পি.আই(এম) দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন ভবিষ্যতে এবং নকশালবাড়ি-বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিনয় চৌধুরী প্রমুখেরা। ফলে একসময় সি.পি.আই(এম) - এর ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই ভাঙনের পেছনে ছিল সি. পি. আই (এম) দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে ক্ষোভ। বিপ্লবকামী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকেও নয়া সংশোধনবাদী বলে সমালোচনা করতে থাকেন। তাঁদের মতে সি. পি. আই (এম)-এর নেতৃত্ব হল মেকি-বামপন্থী এবং তারা নিজেরা হলেন প্রকৃত বামপন্থী কমিউনিস্ট। কিছুদিনের মধ্যে সি. পি. আই-এর মতো সি. পি. আই (এম) ও একইভাবে নির্বাচনকে বেশি গুরুত্ব দেয়। তাছাড়া মাও-সে-তুং-এর চিন্তাধারার প্রভাব ক্রমশ তাদের চিন্তাধারায় প্রভাব ফেলে। তখন কেউ কেউ মনে করতে থাকেন চীনের পথই হল ভারতীয় বিপ্লবের পথ। এই বিপ্লববাদী কমিউনিস্টরা যে আন্তঃপার্টি মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে ছিল, শেষ পর্যন্ত তা নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের মধ্যে পরিণতি লাভ করে।

১৯৬৭ সালের ১৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের সরকার গঠন করল যুক্তফ্রন্ট সারা ভারতজুড়ে একই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন কেন্দ্রে ছিল ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস। যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রথম সারির মন্ত্রীরা শপথ নেওয়ার আগের দিন কলকাতায় জনসভা হয়। সেখানে জনগণের সমাগমে নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: "অনেক ঝগড়াঝাঁটি করেছি। আর নয়। এখন থেকে সকলে এক হয়ে চলব। বাঙলা দেশের মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করব।"[৬] যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হুমায়ুন কবির ইউরোপে চলে গেলেন এবং যাবার আগে বলে গেলেন, "আজ থেকে বাংলাদেশে যা করে দিয়ে গেলাম ভবিষ্যতে

ভারতেও তাই হবে। এই সুরু হলো যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির যুগ। সমগ্র ভারতবর্ষ এই রাজনীতিকে অনুসরণ করবে।"[৭] কেন্দ্রে তখন শিক্ষা মন্ত্রী হলেন আইনজীবী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। অজয় মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি নিয়ে প্রথম যেদিন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে যান, সেদিন অজয় বাবু ইন্টারভিউ-এ বলেন "নীতিগত বিরোধ ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমরা সবাই জনগণের মঙ্গল সাধনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। করবও তাই।"[৮] যুক্তফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে বড় সমর্থক হল সি. পি. আই (এম)। এই সরকারের ১৮ দফা ন্যূনতম কর্মসূচির ৩ নং কর্মসূচিতে বলা হল 'প্রগতিশীল কৃষি সংস্কার'-এর কথা। ১৪ নং ধারায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল "যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমজীবী কৃষিজীবী এবং সমস্ত স্তরের মেহনতী মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে, জনগণের গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে। যুক্তফ্রন্ট প্রশাসন ব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগকে জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষানুযায়ী 'পুনঃবিন্যাস' করবে"[৯] এগুলো ঘোষণা করল সি. পি. আই (এম) নেতারা প্রাথমিকভাবে 'গণআন্দোলনের ঢাল' হিসাবে এই সরকারকে ব্যবহার করার কথা বললেও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে গণআন্দোলনের নীতিকে কার্যকর করতে পারলেন না বা চাইলেন না।

ইতিমধ্যে বিরোধীপক্ষের নিরন্তর প্রচার ও অপপ্রচারের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে জোতদার, সম্পন্ন ভূস্বামী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী শ্রেণির স্বার্থরক্ষক কংগ্রেস সরকার অপশাসন ছাড়া রাজ্যবাসীকে কিছুই দিতে পারবে না। স্বভাবতই যুক্তফ্রন্ট সরকারের সম্পর্কে তাদের প্রত্যাশা হয় আকাশ ছোঁয়া। সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিরাট আশা-ভরসা। অনেকেই মনে করলেন এবার বাঙ্গালা দেশের ভালো হবে। ধরে নিলেন, এখন থেকে বড়লোকের কর্তৃত্ব কমবে, গরিবের মর্যাদা বাড়বে, দুর্নীতি বন্ধ হবে, জিনিসপত্রের দাম কমবে এবং সব মিলিয়ে বেশ একটা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করা যাবে।

যাঁদের জনগণ বলা হয় অর্থাৎ ট্রামে, বাসে, অফিসে, কাচারীতে যারা গলা ফাটিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন তাঁরা তো আহ্লাদে একেবারে আটখানা। বীরদর্পে বলে বেড়াতে লাগলেন "এবার পাপ বিদায় হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে স্বর্গ-রাজ্য কায়েম হল বলে!"[১০] এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাজ শুরু হল। তবে এই সরকারের পক্ষে যে সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না তা অল্প দিনের মধ্যে ধরা পড়ে গেল। আসলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ইচ্ছা থাকলেও কোনো ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়ার মতো শক্তি ও সামর্থ্য তাদের ছিল না।

ইতিমধ্যে যাঁরা সরকার চালাতে বসলেন দেখা গেল তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রায় শূন্য। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় ও খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে প্রশাসন ব্যবস্থাকে চালনা করার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তারা সরকারি ক্ষমতায় এসেছেন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায়। ফলে নিজেদের উপযুক্তভাবে তৈরি করার কোন সুযোগ পান নি। অথচ রাজ্যবাসীকে নির্বাচন উপলক্ষে নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্যদিক থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্তর্ভুক্ত বামপন্থীদের মতাদর্শগত চেতনা প্রখর ছিল। ফলে পুলিশ ও আমলাবর্গকে তারা বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার যন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা প্রথমেই ধাক্কা খেলেন খাদ্য সমস্যা নিয়ে। প্রথম ক্যাবিনেটেই তাঁদের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল খাদ্য। মন্ত্রিসভার বৈঠকে খাদ্য নীতি আলোচনায় বিশেষ কোনও সুব্যবস্থা করে উঠল না যুক্তফ্রন্ট সরকার। কিন্তু পরবর্তী বৈঠকে মন্ত্রীরা সিদ্ধান্ত নেন- প্রথমত, মন্ত্রীদের বেতন হ্রাস করা হবে; দ্বিতীয়ত, মন্ত্রীদের ঘর থেকে ঠান্ডা যন্ত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। ফলে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার কোনও রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন না, সবাই পূর্ণমন্ত্রী। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বড় সমর্থক ছিল সি. পি. আই (এম) প্রভাবিত সরকারী কর্মচারী সংগঠন। ফলে সরকারি কর্মচারীদের সি. পি. আই (এম)- এর পক্ষ থেকে খুশি রাখার প্রবণতা দেখা দিল। ধীরে ধীরে তার ফলে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে কর্তব্য পালনে শিথিলতা দেখা দিল।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের একটি ঐতিহাসিক কীর্তি হল পরিবহনমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উদ্যোগে ট্রাম কোম্পানির পরিচালন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তবে এ বিষয়ে সরকারের বিশেষ উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজন ছিল ট্রাম চলাচল ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত উন্নয়নে। কিন্তু সরকার সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে ত্রাণকর্মীদের খুশি রাখার কথা ভাবে। এদিকে যুক্তফ্রন্ট সরকার কাজ শুরু করার দু'মাসের মধ্যেই উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি অশান্ত হয়ে ওঠে কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তারা একসময় সি. পি. আই (এম)-এ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু দলকে সংসদীয় রাজনীতির সরল রাস্তায় অগ্রগামী দেখে সি .পি. আই (এম)-কে শোধনবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁরা দল ছেড়ে বেরিয়ে যান। ফলস্বরূপ নকশাল বাড়িতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। সি. পি. আই (এম)- এর পক্ষে নকশালবাড়ি আন্দোলন ছিল অস্বস্তিকর যুক্তফ্রন্ট সরকার ও সি. পি. আই (এম) উভয় পক্ষের কোনো স্পষ্ট নীতি এবং অবস্থান ছিল না যে কিভাবে তারা নকশালবাড়ি ঘটনার মোকাবিলা করবে। ফলে খাদ্যনীতি ও নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙনের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে সকলের কাছে।

প্রসাদজোতের কৃষক-পুলিশ সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় নকশাল বাড়িতে ২৭ মে জনসভায় এ বিষয়ে বলেন যে তিনি কৃষকের জোর করে জমি দখলের লড়াইকে সমাজ বিরোধী কাজ বলে মনে করেন এবং পুলিশের গুলি চালানোকে প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন করেন। অন্যদিকে সি .পি. আই (এম)-র রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক ২৬ মে পুলিশি গুলি চালানোকে নিন্দা করেন। এইভাবে নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরীণ মতভেদ ক্রমে বাড়তে থাকল। পরবর্তীকালে ৫ জুলাই, ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার নকশালবাড়িতে পুলিশি অপারেশনের সম্মতি দেয়। এই পুলিশি অভিযানের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন ক্রশবো'। এই অভিযানে ঠিক করা হল যে আন্দোলনকারীদের পালাবার সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হবে, প্রচুর পরিমাণে পুলিশ দিয়ে

এলাকাকে ঘিরে ফেলা হবে, আন্দোলনকারীদের উপর চাপ দেওয়া হবে আত্মসমর্পণের জন্য এবং আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যেতে হবে। যার ফলে অন্য এলাকার আন্দোলনকারীরা ভয় পেতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে এতদিনকার বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ নতুন করে জেগে উঠল। ফলে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতিমুখ পরিবর্তিত হল। কলকাতার ছাত্র-যুবকরা দেওয়ালে লিখল-

'তোমার বাড়ি আমার বাড়ি,

নকশালবাড়ি নকশালবাড়ি।'

নকশালবাড়ি আন্দোলনের পেছনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা আংশিক বা পরোক্ষ ভাবে একটা মাত্রায় কাজ করেছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নকশালবাড়ি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের পর সারা ভারতে সি. পি. আই (এম) পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং অন্ধপ্রদেশের বহু পার্টির সদস্য ও নেতা নকশালবাড়ির পক্ষে এসে দাঁড়ান। ১৯৬৯ সালের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর নতুন পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর সি. পি. আই. এম (এম-এল)- এর গঠন ছিল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে সি. পি. আই (এম) একটি নয়া সংশোধনবাদী পার্টিতে পরিণত হয়েছিল। সেই পার্টির মধ্য থেকে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম চালিয়ে বিপ্লবীদের রাস্তায় নিয়ে আসার কোনও সুযোগ ছিল না। সি. পি. আই (এম-এল) গঠনের আগেই কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটির ১৯৬৯ সালে সামাজিক- সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে। এই সি. পি. আই (এম-এল) গঠন দেশজুড়ে কৃষক সংগ্রামকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে ডেবরা-গোপীবল্লভপুর, সিংভূম জেলার বহড়াগোরায় যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ

ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহ ফেটে পড়েছিল। এছাড়া বিহারের মুসাহারি, উত্তরপ্রদেশে লখিমপুর-খেতরি এবং অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রীকাকুলাম জেলাতেও কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল।

দেশজুড়ে ছাত্র-যুবকদের মধ্যেও নকশালবাড়ি ও সি. পি. আই (এম-এল) এক বিরাট উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। আসলে ছয়ের দশকের শেষ ভাগে গোটা পৃথিবী জুড়েই যুব-ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, পাটনা এবং অন্যান্য শহরগুলিতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিপ্লবী বিস্ফোরণ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হল এঁরা কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হলেন। এর ফলে সি.পি.আই.(এম-এল) দলের হাত ধরে নতুন রাজনীতি নির্মাণের যে প্রচেষ্টা শুরু হল, তার কারণ হল- "যে বিষয়টা আকৃষ্ট করল তা হলো প্রচলিতকে অমান্যতা, কাঠামোকে অস্বীকৃতি। শুধু বদলানো না, ভেঙে গড়ে তোলা। রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রে যা প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাকে প্রশ্ন করে নতুন কিছু সন্ধান, এটাই প্রাধান্য পেল।"[১১]

নকশালবাড়ি আন্দোলন প্রবল এক রাজনৈতিক ঝড়ে সূচনা করেছিল। নকশালবাড়ি আন্দোলন দাবি করেছিল হয় রাজনৈতিক উদ্যম বিপ্লব-আকাঙ্ক্ষী কমিউনিস্টদের হাতে আসুক। বর্তমান শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার অনৈতিক কাঠামোকে ধুলিসাৎ করে নতুন সমাজ ব্যবস্থা পত্তনের স্বপ্ন দেখেছিল মানুষ। "নকশালবাড়িতে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। এটা গ্রামবাংলার প্রায়শই হয়ে থাকে। জমির লড়াই, পুলিশের সঙ্গে লড়াই এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু একই ঘটনা অন্য চেহারা নিয়েছিল। তখনকার রাজনীতিক প্রেক্ষিতটা অন্যরকম ছিল। সবাই মিলে প্রতীক্ষায় ছিল একটা নতুন কিছু করার জন্য। নকশালবাড়ির ঘটনা তার প্রেরণার কাজ করেছিল।"[১২]

নকশালবাড়ি আন্দোলন চরিত্রগতভাবে রাজনৈতিক হলেও এর মূলে রয়েছে নানান ধরনের বঞ্চনা অর্থনৈতিক শোষণ এবং গ্রাম সমাজের বিভিন্ন বৈষম্য। তাই নকশালবাড়ি একটা ভিন্ন রাজনৈতিক ধারার জন্ম দিয়েছিল। এতদিনকার রাজনীতি ছিল ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে ক্ষমতা বৃদ্ধির হাতিয়ার, সেখানে নকশালবাড়ি বিভিন্ন ধারা শুরু করল- জনগণের সেবা করো ও জনগণের সঙ্গে একাত্ম হও। দেশজুড়ে তীব্র বিতর্ক আর উত্তাল সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সংশোধনবাদী সি. পি. আই.-সি. পি. আই (এম) এবং মার্কসবাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে সুস্পষ্ট ছেদ টেনে দিয়েছিল নকশালবাড়ি আন্দোলন।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন চারু মজুমদার। চারু বাবু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও-সে-তুং চিন্তাধারায় মতাদর্শগত বিশ্বাসী ছিলেন। এদেশে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মধ্যে মাও-সে-তুং চিন্তাধারার প্রতি আনুগত্য গড়ে তুলতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। চারু বাবু বলেছিলেন : "নকশালবাড়ি সংগ্রামের যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি তা হল কৃষক জমি বা ফসলের জন্য এ সংগ্রাম করেনি, সংগ্রাম করেছে রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য।"[১৩] ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে 'দেশব্রতী' পত্রিকায় চারু মজুমদারের লেখার শিরোনাম ছিল 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', উপ-শিরোনাম হল 'চীনের পথ আমাদের পথ।' এই লেখায় তিনি বলতে চেয়ে ছিলেন যে অতীতের সমস্ত বিপ্লব, বিদ্রোহ ইত্যাদির ব্যর্থতার কারণ হল সঠিক নেতৃত্বের অভাব। ভারতীয় বিপ্লবের স্তর নয়া গণতান্ত্রিক, কৃষি বিপ্লবই প্রধান অন্তর্বস্তু, শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে কৃষকই এর প্রধান শক্তি ইত্যাদি তিনি বারবার প্রচার করে গেছেন। ১৯৬৫ সালটি তাত্ত্বিক বিতর্কের ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ দিন-চিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এ বছরই চারু মজুমদার লিখতে শুরু করেন তাঁর বিখ্যাত 'আটটি' দলিল যা ১৯৬৭ সালে লেখা শেষ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় প্রথমে 'দক্ষিণ দেশ' পত্রিকা ও পরবর্তীকালে মাওবাদী কমিউনিস্ট কেন্দ্রের রাজনৈতিক সংগঠক অমূল্য সেনের প্রবন্ধ 'নয়া-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র'- যা ১৯৬৫-র মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল

‘চিন্তা’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়। নকশালবাড়ি সংক্রান্ত কোনো আলোচনায় এই ‘আটটি দলিল’-কে বাদ দিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ করা যাবে না।

চারু মজুমদারের ‘আটটি দলিল’ যথাক্রমে নিম্নরূপ-

১. বর্তমান অবস্থায় আমাদের কর্তব্য।

২. শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করে তুলুন।

৩. ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহের উৎস কী?

৪. আধুনিক শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান।

৫. ১৯৬৫ সাল কী সম্ভাবনার নির্দেশ দিচ্ছে?

৬. সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাচ্চা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামই তখনকার প্রধান কাজ।

৭. সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সশস্ত্র পার্টিজান সংগ্রাম গড়ে তুলুন।

৮. সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই কৃষক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সি.পি.আই.(এম-এল) যখন গঠন হয় তখন চারু মজুমদার তাঁর দলিলের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। তিনি দলিলে বলেছিলেন কৃষি বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করতে হলে রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসসাধন আবশ্যক। সেটা না করে আন্দোলনে যাওয়া মানে সংশোধনবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া। কৃষি বিপ্লবের পথে কোনো রকম অর্থনৈতিক দাবির কথা থাকবে না। ফলে অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সুবিধাবাদ কে প্রশ্রয় দেবে। পার্টি সংগঠনকে যতদূর সম্ভব বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত করতে হবে। কৃষিবিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে মুক্তাঞ্চল গঠন করতে হবে। এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের চিন্তা কেন্দ্রীয়ভাবে সংশোধনবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। সরকার যেকোনো সশস্ত্র

সংগ্রামকে দমন করার চেষ্টা করে থাকে তাই সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন অর্থসংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি ও রাজনৈতিক চিন্তার দূরদর্শিতা। যেহেতু তিনি চিনা মতাদর্শে বিশ্বাসী তাই সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য গেরিলাপন্থী অবলম্বনকে বেছে নেন। চারু মজুমদার শুধু কৃষি বিপ্লব ও গেরিলা আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন তাই নয়; তিনি বলেছেন বিপ্লবের জন্য আত্মত্যাগ প্রয়োজন এবং নেতৃত্বের অভাবের জন্য বিপ্লবের বাণী শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে প্রচার করা ও তাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা প্রয়োজন। ভারতীয় বিপ্লবের মূল কথা হল কৃষিবিপ্লব। পাশাপাশি ছাত্র-যুবকেরা আদর্শের নিরিখে এই আন্দোলনে দলে দলে যোগদান করে। ফলে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া থেকে আসা ছাত্ররা নিজেদেরকে সাধারণের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবে। তাই চিনের বিপ্লব ও অন্যান্য বিপ্লবের কথা তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন। শহরাঞ্চলে পার্টির সদস্যরা গণসংগঠন, যেমন- শ্রমিকদের টেড ইউনিয়ন, ছাত্রদের কলেজ ইউনিয়ন ইত্যাদি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, নেতৃত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী চারু মজুমদার ছিলেন না। এমনকি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবির ক্ষেত্রেও পার্টির সদস্যরা কোনো প্রকার নেতৃত্ব দেবে না।

১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। এই কালপর্বে শহরে নকশালপন্থীদের দাপটে এক ভয়াবহ অবস্থা দেখা দেয়। নকশালপন্থীরা প্রথমে সি পি আই (এম)-কে তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেন শ্রেণিশত্রু নিধনের নামে। ফলে পাড়ায় পাড়ায় তখন প্রকাশ্যে বোমা আর পাইপগান নিয়ে লড়াই চলতে থাকে। এইভাবে নির্বিচারে চলতে থাকে তাঁদের ব্যক্তিহত্যা। অথচ সমাজের ওপরতলার মানুষ তাঁদের আক্রমণ থেকে রেহাই পান। একদিকে পুলিশ, মিলিটারি এবং সি.আর.পি- দের নেওয়া হল, অন্যদিকে কংগ্রেসের লোকজনদের নেওয়া হল। এর ফলে নকশাল আন্দোলনের তৃণমূল স্তরে যাঁরা ছিলেন ক্রমে তারা আন্দোলনের বিরোধী হয়ে উঠলেন। ফলে নকশাল আন্দোলন ধীরে ধীরে ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল। আন্দোলনের মধ্যে এইসময় অনেক বেনোজল ঢুকে পড়ল এবং নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতান্তরের সৃষ্টি হল।

১৯৭০-এ মার্চ মাসে চারু মজুমদার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখলেন যে তারা যদি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয় তবে ১৯৭১- এর গোলাতে মুক্তি ফৌজ গড়ে উঠবে। এক্ষেত্রে চারু মজুমদার অনেক বেশি আশাবাদী ছিলেন। এরপর সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে নকশাল দমনে ঝাঁপিয়ে পড়েন কারণ এরা আন্দোলনকে কড়া হাতে প্রতিহত করার লক্ষ্যে সচেষ্ট হয়। তারপর ধীরে ধীরে আন্দোলন প্রায় স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৭২- এ বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটা জায়গায় আন্দোলন এর রেশ দেখা যায় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তত দিনে নকশাল আন্দোলন প্রায় শেষের পথে। এছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কিছু কিছু জায়গায় নকশালবাড়ি আন্দোলন লক্ষ করা যায়। নকশালবাড়ি আন্দোলন যা ছিল বৈপ্লবিক প্রয়াস, তা ক্রমশ বৈপ্লবিক সন্ত্রাসে পরিণত হয়ে গেল। ১৯৭২ সালের ২৮ জুলাই লালবাজারের লক-আপে চারু মজুমদারের মৃত্যু হয়। এটা নকশালবাড়ি আন্দোলনের উপর বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়ায়। তাই শেষ পর্যন্ত সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করা সম্ভব হল না। ফলে নকশালবাড়ি আন্দোলন একেবারেই নির্বাপিত হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গে।

সবশেষে বলা যায় নকশালবাড়ি আন্দোলন অনন্য হয়ে উঠেছিল পার্টি নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করে কৃষকদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে। পার্টি নামক প্রতিষ্ঠানটির একদিকে যেমন শ্রমজীবী মানুষদের সংগ্রাম বিকাশে সহযোগী ভূমিকা নেয়, তেমনি বিশেষ বিশেষ সময়ে তা সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে নেতৃত্বের চেতনা ও গণচেতনার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য তৈরি হয়, যা অনিবার্যভাবে গণ-উদ্যোগে ভাঁটা পড়ে এবং পার্টির সঙ্গে আন্দোলনরত মানুষের বিচ্ছিন্নতা গড়ে ওঠে। ফলস্বরূপ সংগ্রাম বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পার্টি নামক প্রতিষ্ঠানটি। নকশালবাড়ি আন্দোলন এইভাবে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের পূর্ববর্তী নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল প্রথমোক্ত ধরনের এবং পরবর্তী পর্যায়ে

নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল দ্বিতীয় রকমের। যে কোনো আন্দোলনের মতোই নকশাল আন্দোলনের চেহারা পালটেছে। তবু জনমানসে আন্দোলনের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়ে আছে।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের যে পীড়ন হয়েছিল, সেই পীড়নের ঐতিহাসিক ছবি ধরা আছে সেই সময়ে যারা জেলে গিয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতিকথায়।" নিজের ছোট ছোট সমস্যা ছোট ছোট সাফল্য ব্যর্থতা সব তুচ্ছ হয়ে গিয়ে হয়ে উঠছি দেশে দেশে কালজুড়ে ছড়িয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের একজন আত্মীয়। বিভিন্ন বইয়ের, পত্রিকার, কাগজের পাতা থেকে উঠে আসা সব চরিত্রেরা হয়ে উঠছে আপনজন। সায়গনের শহীদ ন্‌গুয়েন ভান ত্রয়, মরণান্তিক অত্যাচারিতা বান থি দিন্‌- যাকে সবাই বলে ভিয়েতনামের জোয়া, এদের রাস্তা আমার রাস্তা, আমি এদের পরিবারের একজন- আনেক বিরাত এক সংগঠিত মানবদলের সদস্য হিসেবে নিজেকে দেখতে পাবার বিপুল পুলক সমস্ত দিন-রাত্রির মানেই পাল্টে দিচ্ছে।"[১৪] সাতের দশকে যে আদর্শ বা আদর্শের ধারণা নিয়ে বিপুল জনমানস আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেই আদর্শের কোথাও বিচ্যুতি ঘটে নি যখন তাঁরা জেলে গিয়ে অত্যাচারিত হয়েছেন। সেইসব জেল জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনাকে একত্রিত করে আন্দোলনকারীরা জেলের ভেতরে বা বাইরে এসে নিজেদের স্মৃতিকথাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেইসব স্মৃতি কথাগুলির আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে। এক্ষেত্রে নকশালবাড়ির রাজনৈতিক পটভূমি বিশেষভাবে ভূমিকা গ্রহণ করে। যার ফলে স্মৃতিকথাগুলি তৎকালীন যুগের মহিমায় আমাদের বিশেষ ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

তথ্যসূত্র :

১. *অনীক,* 'নকশালবাড়ি : ৫০ বছর', কলকাতা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৭, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৭-৮, দীপঙ্কর চক্রবর্তী (সম্পা.), পৃষ্ঠা. ২২

২. *এবং জলার্ক*, 'চারু মজুমদার সংখ্যা ৮', গড়িয়া, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০১৩, ষোড়শ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, স্বপন দাসাধিকারী (সম্পা.), পৃষ্ঠা. ৭

৩. সুনীতি কুমার ঘোষ, *নকশালবাড়ি : একটি মূল্যায়ন*, কলকাতা, পিপলস্ বুক সোসাইটি, দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা. ১৪৯

৪. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর*, কলকাতা, পার্ল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৯৭, পৃষ্ঠা. ১০৪

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১০৩

৬. বরুণ সেনগুপ্ত, *পালাবদলের পালা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৭১, পৃষ্ঠা. ১৫

৭. পূর্বোক্ত

৮. পূর্বোক্ত

৯. *অনীক*, 'নকশালবাড়ি : ৫০ বছর', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮০

১০. বরুণ সেনগুপ্ত, *পালাবদলের পালা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৬

১১. পুলকেশ মণ্ডল ও জয়া মিত্র (সম্পা.), *সেইদশক, নকশালপন্থী আন্দোলন : ফিরে দেখা*, কলকাতা, প্যাপিরাস, প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৯৪, পৃষ্ঠা. ১৩৫

১২. পূর্বোক্ত

১৩. প্রমোদ সেনগুপ্ত, *বিপ্লব কোন্ পথে?* কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ১ মে ১৯৭০

১৪. পুলকেশ মণ্ডল ও জয়া মিত্র (সম্পা.), *সেইদশক, নকশালপন্থী আন্দোলন : ফিরে দেখা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

অত্যাচারিতের বয়ান

অত্যাচারিতের বয়ান

স্বাধীনতা আন্দোলন পর্বে এক মনীষী কারাগারগুলিকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন, "These are the factories for crushing humanity অর্থাৎ মানবতার মারণ কেন্দ্র যেন কারাগার।"[১] স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ পর্বে জেলখানার কাহিনি বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র এক শাখা হয়ে উঠেছে। কেবল কংগ্রেস শাসিত রাজ্যেই নয়, অকংগ্রেসি এমনকি বামফ্রন্ট শাসিত রাজ্যেও প্রতিটি কারাগারই নিদারুণভাবে অস্বাস্থ্যকর, অমানবিক যা সভ্য সমাজের বুকে ক্ষতের আকার ধারণ করে। "জেলখানা হল মানুষের জ্যান্ত কবর দেবার জায়গা। ... প্লেগের সময় রোগীদের আস্তানায় যত না রোগের সন্ধান পাওয়া যায় এখানে রোগ তার চেয়ে বেশি, আর গরমের দিনে... কুকুরশালাতেও এমন দুর্গন্ধ হয় না।"[২] জেলস্মৃতিগুলিতে আন্দোলনের পাশাপাশি তাদের উপর নিপীড়নের ইতিহাস আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে পুরুষের লেখা জেলস্মৃতিগুলিতে অত্যাচারের ইতিহাস খুব বেশি পাওয়া যায় না। তবে মেয়েদের লেখা জেলস্মৃতিগুলিতে অত্যাচারের অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়।

কংগ্রেস শাসিত পশ্চিমবঙ্গে বন্দি নির্যাতন- দৈহিক ও মানসিক এবং জেলের জীবন সম্পর্কে জানতে হলে বর্তমান গ্রন্থগুলি একমাত্র পূর্ণাঙ্গ দলিল। জেলের বাইরের জীবনের সঙ্গে জেলের ভেতরের জীবনের কতটা পার্থক্য তা জানতে হলে ফিরে আসতে হবে আবার জেলস্মৃতিগুলির মধ্যে- যেখানে দেখা যাবে কীভাবে জেলের গরাদ বন্দিদের নিয়ত গ্রাস করে, মনুষ্যত্বের ন্যূনতম দাবিটুকুকেও অস্বীকার করে। জেলস্মৃতিগুলি থেকে সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাধারা মত ও পথের বহু শাখার বিস্তার, ঐক্য ও সংঘাত এবং অতীত ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য ও উপকরণ পাই। সেই সঙ্গে জেলস্মৃতিগুলি থেকে যে ভয়াবহ জেলের ভিতরকার ছবি পাওয়া যায় তা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সৃষ্টিশীল সাহিত্যের মূল্যে অভিজ্ঞতার যে মৌলিক উপাদান নিহিত আছে- এগুলি হল সেই উপাদান। সেই অভিজ্ঞতায় প্রশাসন ব্যবস্থায় জেল ও জেলের অভ্যন্তরে শাসন-

পীড়নের রীতি-পদ্ধতি এবং জেলের ভেতরে যে অন্ধকার ছায়ামিছিল ছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কারাগারে ১৮ বছর

আমেরিকার এক সাংবাদিক বিশ্বভ্রমণের পর ভারত সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন- "ভারতে গিয়ে আমি ভগবানের সাক্ষাৎ পেয়েছি। ভগবানের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ ভারতবাসীদের বেঁচে থাকা। ভগবান না-বাঁচালে কোনো মানুষ ওই অবস্থায় দু-দিনেও বাঁচতে পারে না।"[৩] আজিজুল হক দীর্ঘ ১৮ বছর জেলে বন্দি অবস্থায় ছিলেন। জেলে থাকাকালীন জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিনি নানা অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। জেলে গিয়ে দেখেছেন বাস্তবের রূঢ় রূপ। তাঁর মনে হয়েছে- "জেল হল ম্যাগনিফাইং গ্লাস। এখানে নীচ লোকের নীচতা, ক্রূরতা শতগুণ ম্যাগনিফায়েড হয়ে দেখা যায়, আবার তোমার যদি সামান্যতম সৎ গুণ থাকে সেটাও অনেক বড়ো হয়ে ধরা পড়ে। এখানে কেউ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না।..."[৪]

সাতের দশকের জেল মানে নরক। লাঠি পেটা, খুন, না খেতে দিয়ে মারা, পঙ্গু করে দেওয়া ইত্যাদি ছিল জেলের অত্যাচারের বৈশিষ্ট্য। এইসব বৈশিষ্ট্যের কথা গৌরকিশোর ঘোষ থেকে মেরি টাইলার সকলেই প্রায় স্বীকার করে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আজিজুল হক বলেছেন- "... জেলটা নরক, চিরকালই ছিল, আজও আছে। তাছাড়া, আমি তাদের উচ্ছেদ করার জন্য লড়াই করব- তারা আমাকে দুধে-ভাতে রাখবে এটা ভাববই বা কেন? তাই জেলে অত্যাচারটা কোনো বলার মতো ঘটনাই নয়। বলার যেটা, সেটা হল এই অত্যাচারের জাল কেটে জীবন কীরকম নিজেকে ঘোষণা করেছে- জীবনের এই দৃপ্ত ঘোষণাটাই জেল-জীবনের বলার কথা।"[৫]

নকশাল ওয়ার্ডে যখন নকশাল বন্দিদের উপর অত্যাচার করা হত তখন এ অত্যাচারের নেতৃত্বে থাকতেন স্বয়ং জেলারবাবু। সেই সময় কমরেডরা হেসে হেসে স্লোগান তুলত-

‘নকশালবাড়ি লাল সেলাম’, ‘শত শহীদের রক্তে রাঙা লাল পতাকা লাল সেলাম’ ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো কমরেড গান ধরত-

“আমরা তো ভুলি নাই শহীদ। সে কথা ভুলব না

তোমার বুকের খুনে রাঙাইল গো আধাঁর জেলখানা...”[৬]

এরপর শুরু হয় অত্যাচারের লীলা। নম্বরে নম্বরে সি.আর.পি ঢুকে যাকে পাচ্ছে তাকেই পেটাতে শুরু করছে। “ব্যাস শুরু হয়ে গেল লাঠিপেটা। সাপ-পেটানোর মত লাঠি পড়তে শুরু করেছে। এতগুলো লাঠি একসাথে পড়ার জন্য লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকির আওয়াজ। ‘বালক ব্রহ্মচারীর জয়ধ্বনি। পাশবিক উল্লাস...’ বার দুই মাথা তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম।”[৭] তখন কমরেডদের মনে হতে শুরু করে যে শহরাঞ্চলেও খতম করাটা দরকার ছিল। জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারে বহু কমরেড জেলের মধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন। এই সময় দমদমে প্রায় ৫০ জন মারা যান, বহরমপুর জেলে তিমির শহিদ হন এবং আলিপুর বন্দি হত্যার রেকর্ড হল, পাশাপাশি সিউড়ি জেল ও বর্ধমান জেল বাকি থাকল না। এরপর ধীরে ধীরে জেল প্রশাসন সরাসরি পুলিশের হাতে চলে যায়।

আজিজুল হক ধরা পড়ার ২৪ দিনেও লোকে জানতে পারে না। লালবাজারে কখনো ‘রামশিশির যাদব’, কখনো ‘ভোলা সিং’, কখনো ‘আব্দুর রহিম’ হয়ে বিরাজ করতে থাকেন। প্রায় দেড় মাস জেল-হাজত খাটার পর তিনি আজিজুল হক হয়েছিলেন। দেড় মাস এক পাল নররক্তলোভী নেকড়ের মধ্যে থাকা যে কী ব্যাপার সেটা জানতে পারেন। একটা লোক এসবের মাঝে থেকে যখন মানুষ হিসেবে বেরিয়ে আসে- “তার শরীরে সর্বত্রই মানুষের অধিকার-অর্জন চিহ্ন। হাত-পা ভাঙ্গা, নখের কোলে কোলে রক্ত জমে পচা ক্ষত, মাথার চাঁদিতে দগদগে ঘা, পুরুষ হলে যৌনাঙ্গের দুপাশে কালশিটে দাগ- বৈদ্যুতিক শকের চিহ্ন হিসাবে থেকে গেছে, নারী হলে-

স্তনের বোঁটায় ফোস্কা কিংবা ক্ষতবিক্ষত স্তন-বোঁটা! হ্যাঁ, এগুলোই আমাদের দেশের মনুষ্যত্বের চিহ্ন!"[৮] গণতন্ত্রের দেওয়া মনুষ্যত্বের সবকটা চিহ্নে চিহ্নিত হয়েও আজিজুল হককে কোর্টে তোলা হয় এবং পনের দিন পুলিশ হাজত হয়। বাইরে যত না রাজনৈতিক কর্মীদের বিক্ষোভ তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষোভ, গ্লানি ছড়িয়ে ছিল চার দেয়ালের অভ্যন্তরে। তারই ফলশ্রুতিতে জন্ম নিয়েছিল জেল দুর্নীতির।

আজিজুল হকের *কারাগারে ১৮ বছর* এরাজ্যে ১৯৬০, ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র সময়ে বিরোধী রাজনৈতিক বন্দিদের উপর রাষ্ট্রের নিপীড়নের এক অনন্য ও ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে সেই সময়কার আর্থ-সামাজিক বাতাবরণ, সাধারণ মানুষের অবস্থান এবং রাজনীতিতে জড়িত নয় এমন মানুষের কথাও বর্ণিত হয়েছে। বন্দিমুক্তি আন্দোলনের পর ১৯৬৬-র অক্টোবর মাসে জনতার রোষে জেলের গরাদ খুলে যায়। জেল থেকে মুক্ত হয়ে আজিজুল হক জেলজীবনের উপলব্ধি থেকে বলেছেন- "নরকের প্রথম স্বাদ শেষ করে আজ সম্পূর্ণ নারকীয় বাতাবরণে চোখ থেকে লালা ঝরা শয়তানদের দ্বারা ঘেরাও। দেবতারা সকলে মিলে সেদিন যে শয়তানের সৃষ্টি করল আজ সে 'আনডন্টেড'।..."[৯] জেল থেকে মুক্তি পাবার পর এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন যে এই পিরিয়ডে কি আপনার উপর অত্যাচার করা হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে আজিজুল হক বলেছিলেন- "শুধু পায়ের তলায় ডাণ্ডা মারাটাই কি অত্যাচার? আপনার হাত-পা বেঁধে আপনার সামনে যদি আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করানো হয়, আপনার মায়ের মতো বয়সি কোনো মহিলাকে লাঞ্ছনা করা হয়, আপনার ভাই, আপনার আত্মজদের হাত-পা ভেঙ্গে দেওয়া, সেটাকে কি অত্যাচার বলবেন? ... যন্ত্রণাবোধটা তো মস্তিষ্কের ব্যাপার। কারও কারও মস্তিষ্কটা থাকে পায়ের তলায়, কিংবা হাতের হাড়ে, কারও-বা হৃদয়েই মস্তিষ্কের অধিষ্ঠান। তাই হাতের হাড় ভাঙলে কিংবা পা ফাটলে কেউ মনে করে আমি অত্যাচারিত। আবার যখন কোনো লোক কোনো মানুষের হৃদয়টাকে লোহার নাল পড়া বুট দিয়ে থ্যাঁতলাতে

থাকে সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে। পাথরে মাথা ঠুকে মাথা ফাটলে ঘা হয়, ঘা শুকিয়ে যায়। হাড় ভাঙলে হাড় জোড়া লাগে। এই ক্ষতগুলো যেমন-যেমন সেরে উঠতে থাকে, অত্যাচারিত মানুষ পারলেও ভুলে যেতে পারেন অত্যাচারীকে। কিন্তু থ্যাঁতলানো হৃদয় জোড়া লাগে না। সেখান দিয়ে অনবরত রক্তক্ষরণ হতেই থাকে।"[১০]

বিশিষ্ট নকশালপন্থী নেতা আজিজুল হক বিচারের নামে দীর্ঘ কয়েক বছর জেলে বন্দি ছিলেন। যুগে যুগে স্বাধীনচেতা মানুষেরা কারাগারকে নিয়ে অনেক কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে জেলখানা নিয়ে তুমুল আলোড়ন হয়েছিল ১৯৭০-৭৬ সালে। এটা যত না বন্দিদের প্রতি মমত্ব বোধ থেকে, তার থেকেও অনেক বেশি ব্যবহার হয়েছিল রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে। সেই জন্য তখন দাবী উঠেছিল কারাগারকে সংশোধনাগার করা হোক। এর ফলে কোনো কোনো দেশে সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে বন্দিদের যুক্ত করা হল যাতে তাদের চরিত্রের মানবিক প্রবৃত্তিগুলোকে প্রকাশ পায়। সমাজ জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিল সরকার। এত কিছুর পরেও করাগারের অভ্যন্তরের পরিকাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয়নি। উৎপল দত্তের মত নাট্যকার অতিনাটকীয় ঢঙে আর বলবেন না- "প্রস্রাবের গন্ধে ভরা কারাগারকে মনে হয় ফুচিকের স্মৃতিধন্য কারাগার।"[১১]

আজিজুল হককে বিচারের নামে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বন্দি করে বিভিন্ন জেলে পাঠানো হয়। "বামফ্রন্ট আমলে কারাগারগুলো নরকে পরিণত হয়েছে। নরকে নাকি পাপ শোধন করে মোক্ষ হয়। এখানে মানুষের মনুষ্যত্বের অবশিষ্টাংশগুলোকে শোধন করে জন্তু বানান হয়। মানুষকে এখনও এখানে সংখ্যায় কিংবা 'ফালতু' হিসেবে ডাকা হয়। নাম যদি মানুষকে অন্য মানুষের সঙ্গে পার্থক্য করার মাধ্যম হয় তাহলে বলতে হবে 'They have become numbers'। একটা মানুষ 'ফালতু' মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান এ দেশেই সম্ভব।"[১২]

বামফ্রন্ট আমলে বন্দিদের নিয়ে জেলে প্রতিবাদ করার মতো কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না, তাই জেলের মধ্যে যে মৃত্যুর কারখানা তৈরি হয়েছিল সেগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ পায় না। জেলের মধ্যে বন্দিরা প্রায়শই বিনা চিকিৎসায় এবং না খেতে পেয়ে মারা যেত। আবার অনেক সময় হত্যা করে তাকে সাধারণ মৃত্যু হিসাবে তুলে ধরা হত। তারই ছবি প্রতিফলিত হয়েছে নিম্নলিখিত ঘটনাই- "বহরমপুর জেলে মহিলা নকশালবন্দি, যাকে চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বীরভূম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়, সেই মালা দাসের তিন মাসের বাচ্চাকে ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা করে কয়েদিদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। ডাক্তার যখন বারবার বলছে- 'বাচ্চার মা কোথায়? এর মা কোথায়?' তখন 'হোম ডিপার্টমেন্টের পারমিশন নেই, তাই মাকে আনা যাবে না- এই ছিল জেল কর্তৃপক্ষের সাফ জবাব। বুঝুন মনুষ্যত্ব! ধন্য আইন! এটাও 'বার'! কংগ্রেস কারাগারে যার জন্ম হয়েছিল কংস ধ্বংস করার ঘৃণা তার মায়ের মত হাজার মায়ের বুকে জ্বেলে দিয়ে 'নকমাল ডেথ সার্টিফিকেট' গলায় ঝুলিয়ে সে মরে গেল। স্রেফ নার্সিং- এর অভাবে।"[১৩]

হন্যমান

সাতের দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে বন্দি হয়ে সাড়ে চার বছর কাটিয়েছেন জয়া মিত্র। *হন্যমান* গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যক্তিগত বন্দিজীবনের স্মৃতিমাত্র নয়, রাজনীতির কথা তো প্রায় নেই বললেই চলে। ব্যক্তিমানুষের যন্ত্রণার সীমাকে ছাড়িয়ে সমগ্র মানব-পটভূমির আর্তির অপরিসীমে ব্যাপ্ত হয়েছে এর সংকেত। জেলের যে প্রাচীরটি দেখতে সাধারণত আমরা অভ্যস্ত, তার হিংস্র ছায়া ভিতরে ও বাইরে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কারাগারের একটি অন্ধকার দিককে তিনি আমাদের কাছে উন্মোচিত করেছেন। শোষণ এবং পীড়ন নিরপরাধ মানুষগুলোকে কেমন করে গ্রাস করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, সেই অনালোকিত দিকটিতে আলো ফেলেছেন জয়া মিত্র। জেলের ভিতরের দিকের ছায়ার হিংস্রতার যে প্রকট রূপ তারই অভিজ্ঞান নিয়ে রচিত হয়েছে গ্রন্থটি। ভূমিকায় জয়া মিত্র বলছেন— "যারা সচেতন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, ডাক দিয়েছিল ক্ষমতা

দখল করার, তারা তো অত্যাচার, বন্দিত্ব, মৃত্যু বরণ করেছিল জেনে-বুঝে। তাদের আশ্রয় ছিল দেশের উদ্বেল হৃদয়ে। কিন্ত যারা এসব কিছুই নয়, যারা এই সমাজের মধ্যেই কোনো রকম টিকে থাকতে চেয়ে কিংবা থাকতে না পেরে কোনো অপরাধ করেছে, সামাজিক স্বাস্থ্যের পোকা বাছাই করে 'সংশোধনের জন্য' যাদের রাখা হয় জেলে— কী ভাবে থাকে সেই মানুষেরা?"[১৪]

"জেল সম্পর্কে অজ্ঞতা, ভয় ও অপরিচয়কে সত্তর দশক ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ব্যাপক সাধারণ মানুষের মন থেকে। সমস্ত আড়াল সরিয়ে দিয়েছিল সেই বিপুল ভাঙচুর আর জন-জোয়ারের দশক।"[১৫] ফলে *হন্যমান* গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে নকশাল বন্দিনীর যথাযথ সামাজিক কর্তব্যের খতিয়ান- সেইসব নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের কথা, যারা বাস করে অন্ধকারে, যাদের জন্য পার্টি, বিচার, আইন, উকিল, সমাজ কেউ নেই। তাই তিনি বলেছেন— "নরকের মধ্যে দাঁড়িয়েও মানুষের সাহস আর ভালবাসা— যেখান থেকে, এমনকি মৃত্যুর মধ্য দিয়েও, অপ্রতিরোধ উঠে আসছে জীবন। আর সেই জীবন হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে সমস্ত মানুষের চেতনার দিকে, আশপাশে বাস করা মানুষজনের উদাসীন নিশ্চিন্ততার দিকে। রেখে আসা সেইসব মুখগুলির কাছে, এখন যাঁরা তাদের জায়গা নিয়েছেন— তাঁদেরও কাছে আমার এক দায়বদ্ধতা ছিল।"[১৬] এই দায়বোধ থেকেই জয়া মিত্র বিচারে অবিচারে বিনা বিচারে বন্দি থাকা সুস্থ অসুস্থ মানসিক ভারসাম্যহীন নারী শিশুদের অতলান্ত অন্ধকারের মর্মান্তিক জীবনযাত্রাকে সভ্য সমাজের দরবারে নিয়ে আসেন।

নকশালবন্দিরা যে এক ভিন্ন মাত্রার রাজনৈতিক মতাদর্শের শরিক ছিলেন তা ৭০-এর জেল কর্তৃপক্ষ এবং সরকার সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই যখন ৬০-এর রাজবন্দিদের সরকারি উকিল বিনা অনুরোধেই কোর্টে রাজবন্দির মর্যাদার দাবি করে 'ডিভিসন' দিতেন, তখন নকশালবন্দিদের রাজনৈতিক মর্যাদা পাওয়ার জন্য ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকেই জেলের ভিতর ও বাইরে আন্দোলন করতে হয়েছিল। রাজবন্দির মর্যাদার বদলে নকশালবন্দিদের জুটেছিল

অসহনীয় অত্যাচার। "... একথা বোধহয় সত্য, যে পরাধীন আমলে অন্তত রাজনৈতিক বন্দিরা, স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক কারণে বন্দি দের থেকে অনেক বেশি নিরাপত্তা পেয়েছেন। আন্দামানের সেলুলার জেলকে বাদ দিলে, বৃহত্তর বাংলায় জেলে গুলিতে হত্যার ঘটনা একটি— হিজলী। ১৯৭০-এর ডিসেম্বর থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে শুধু পশ্চিম বাংলার জেলে গুলি বেয়নেটে নিরস্ত্র বন্দি কিশোর-তরুণদের হত্যার ঘটনা পনেরোটি। নিহতের সংখ্যা সরকারি হিসেবেই ৬৫। আহত ৩১০ জন। প্রকৃত সংখ্যা এর অনেক অনেক ওপরে।"[১৭]

জেলের বিশিষ্ট শব্দ, টিকিট, কেসটেবিল প্রভৃতির উল্লেখ করে যেমন তার বিবরণ দিয়েছেন জয়া মিত্র তেমনই জয়লক্ষ্মীদের জেলে আসার ইতিহাসও জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে আরো বলেছেন মায়া, স্বাতী, বিমলাভাবী, ডালিয়া, টুরা, বিজু, বুচকু, বুচকুর মা, কৃষ্ণা, বাণীদি এদের জীবনকথা। আবার মেট্রনদের প্রভাব নিষ্ঠুরতা অত্যাচার জেলের অনিয়ম, অপরিচ্ছন্ন জীবনযাপন এসব দিকেও আলোকপাত করেছেন। জেলখানায় থাকার জায়গা, খাবার, জীবনযাপন, চলাফেরা, কথা বলা, চিকিৎসা পাওয়া, বাড়ির লোকের সাথে দেখা করা ইত্যাদি সব বিষয়ে ছিল এক ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রের, ভয়ানক উপস্থিতি, ব্যবহার। জেলখানার ভিতরে বন্দিরা আক্রান্ত হয়েছেন জেলবাহিনীর হাতে। কোনো কারণ ছাড়াই, বানানো অজুহাতে বন্দিরা আহত হয়েছেন, বন্দিদের হত্যা করা হয়েছে।

৭০-এর নকশালবন্দি দের মত নকশালবন্দিনীরাও জেলের মধ্যে প্রতিবাদী আন্দোলনের সংস্কৃতি এনেছিলেন। জয়া মিত্র তাঁর রাজনৈতিক সহবন্দিনীদের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি জেলে তাদেরই এক 'সেলবন্দি' বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে 'গুণতি'তে না বসা ও 'লক আপ'-এ না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কুড়িজন লাঠিধারী সেপাই নিয়ে জেলার জয়া মিত্র সহ পাঁচজন নকশালবন্দিনীকে চুলের মুঠি ধরে এমন মারধোর করে যে তাঁদের ঠোঁট কেটে রক্ত বেরোয়। এ হল নকশালবন্দিনীদের প্রতিবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কঠোর, নির্মম পদক্ষেপ।

জেলের হাজার ধরনের দুর্নীতি, অবিচার, মানসিক বিকৃতি আর বিষাদের মধ্যেও সর্বহারা সাধারণ বন্দিনী আর তাঁদের হতভাগ্য বাচ্চাদের আজও মানবিক দিকটা জেল সংস্কৃতির উপেক্ষণীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত। নকশালবন্দি-বন্দিনীদের নীরব প্রতিরোধের কাহিনিগুলো রাজনীতির আঙিনায় এই সভ্য সমাজে স্থান পায় নি। এঁদের না আছে ভাষার জোর, না আছে 'বন্দি মুক্তি'-র অধিকার। ষাটোর্ধ্ব রমেজা নানী, "...খায় শুধু ডাল আর তরকারিটুকু। ভাত, সকালের ছোলাসেদ্ধ সব যত্ন করে ধুয়ে চৌবাচ্চার পাড়ে শানের ওপর মেলে দিয়ে, তাকে ঝনঝনে করে শুকোয়। ... নিজে এক দানাও খাবে না ওগুলো— হঠাৎ কোনোদিন সুবিধামত পিছন দিকে কাঁঠালপাতা জ্বেলে থালায় করে ভাজবে— তারপর সব বাচ্চাদের হাতে হাতে দেবে সেই মুড়ি, চিঁড়ে, চালবাজার প্রক্সিটুকু। আমি একদিন চেয়ে খেয়েছি বলে, চিবুক ধরে চুমু খায় নানী— কোঁচকানো গালের আঁকাবাঁকা রেখা বেয়ে দ্রুত গড়িয়ে আসে চোখের জল।"[১৮]

৭০-এর নকশালবন্দিনীরা জেলের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন অসহায়, নিরক্ষর, দরিদ্র মানুষ আইনী জটিলতায় কীভাবে দিনের পর দিন জেলের অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেছেন। ধর্ষিতা হয়েও অনেকে জেলবন্দি হয়েছে আর ধর্ষক হয়েছে মুক্ত। এইভাবে জেল প্রতিষ্ঠান নিজেই গড়ে তোলে এক নিষ্ঠুর, অমানবিক জেল সংস্কৃতি। জেলের এই সংস্কৃতি অনেক সাধারণ বন্দিকেই ঠেলে দেয় অপরাধ জগতের কানাগলিতে।

সাতের দশকে জেলের মধ্যে একদিকে যেমন নকশালবন্দিদের প্রতিবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন, মার্কসীয় দর্শনের পঠন-পাঠনের সঙ্গে গান আর স্লোগানের সংস্কৃতি এসেছিল, তেমনই এরই পাশাপাশি চলছিল জেলের সাধারণ বন্দিদের গতানুগতিক জীবনধারা। নকশালবন্দিরা একটা নির্দিষ্ট মতাদর্শের লক্ষ্যে জেলের মধ্যে সংস্কৃতির ধারা চালু করেছিল। কিন্তু সাধারণ বন্দিদের কোনো সমষ্টিগত সংস্কৃতি নেই। তারা তাদের অতীত আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় বসে থাকে। "যখন কোন বন্দিনী অন্য জেল থেকে সাজা নিয়ে আসে, প্রথম কিছুদিন জীবিত

প্রাণীর ছটফটানি, দম বন্ধ হয়ে আসা, তাকে পাগল করে তোলে। চোদ্দ বছর! মাস দিয়ে, সপ্তাহ দিয়ে, দিন দিয়ে গুণে সে কিছুতেই কোনো কুল দেখতে পায় না—। তারপর ধীরে ধীরে মৃত মানুষের মত, পোষমানা জন্তুর মত ঝিমিয়ে আসে অস্থিরতা। মানুষের পৃথিবীতে, মানুষের সমাজে যা সবচেয়ে স্বাভাবিক সেই আশা আর উদ্যম এই দুটো জিনিসই সবচেয়ে অনিয়ম আর অপ্রয়োজনীয় এখানে। প্রতিটা দিনই ঘন্টা মিলিয়ে আগের দিনের মত। কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বর্তমানও না; কোনো ঋতুচক্র নেই, না আছে কোনো সুখ-দুঃখ ভালোমন্দর ব্যতিক্রমী তরঙ্গ। যে মানবগোষ্ঠী এখানে সম্পূর্ণ গোষ্ঠীগতভাবে খায় শোয় কাজ করে তারা প্রত্যেকে বাস করে একটিমাত্র কালের মধ্যে— অতীত কালে, এবং সে অতীতযাপনে প্রত্যেকেই অতি ব্যক্তিগত।"[১৯]

জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আন্দোলনরত কর্মীদের অনেকেই লিখেছেন, "জীবনের সেই অন্ধকার অংশের কথা- অত্যাচার, পাশবিকতা, হত্যা ও নির্মম বিভৎসার সেই সব স্মৃতি।"[২০] মেদেনীপুর সেন্ট্রাল জেল জয়া মিত্রের জেল জীবনে প্রথম পর্ব। *হন্যমান* লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন- "এটা ঠিক স্মৃতিচারণ নয় বরং বলা যায় অ্যালবাম ওল্টানোর জন্য বসা।"[২১] স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে জেলের সহবন্দিদের কথা বার বার মনে পড়েছে। জয়া মিত্র সহবন্দীদের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন- "চার বছরের অন্ধকার দিনগুলির ভাঁজে ভাঁজে দেখাও অজস্র মুখ অমাবস্যার কালির মধ্যে অজস্র ঝকঝকে তারার মতন তাদেরই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখা, ধুলো ঝেড়ে রাখা আমার বুকের মধ্যে- যেখানে তারা আছে- সেখান থেকে বাইরে এনে রাখার চেষ্টা- বলতে চাওয়া যে, এ শহর বাজারের মাঝ মধ্যিখানে গা ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে আছে কি অদ্ভুত এক জনবসত।"[২২]

জয়া মিত্র মহিলাদের জেলের ভেতরের যে গল্প বলেন তার মধ্যে বন্দিনীর আচরণের জন্য 'মার্কা' অর্থাৎ নম্বর কাটা যাওয়ার ভয়ের বিবরণ ঘুরে ফিরে এসেছে। "এই 'মার্কা' হল জেল কর্তৃপক্ষের হাতের জাদুকাঠি, এই ইশারায় সাজা পাওয়া বন্দীরা ওঠবস করে। কোর্টে একজনের

যত বছরের সাজা হয়, জেলে হাতে ক্ষমতা থাকে বন্দীর 'গুড কনডাক্ট'-এর ভিত্তিতে তা নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিয়ে দেবার। এই 'গড কনডাকট রেমিশানই চলতি নামে মার্কা'- যার উল্লেখমাত্রই উদ্ধততম বন্দীও ফনা নামিয়ে নেয়।"[২৩] সাতের দশকে জয়া মিত্রের সময়ে জেলে বন্দিরা পাগল বলে চিহ্নিত হলে পোশাক পেত না। ফলে বন্দির লজ্জাবোধ থেকে শুরু করে সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করত জেলা প্রশাসন।

জেলের মধ্যে ব জেলখানায় অনেক নিয়ম ছিল। চা বানানো যাবে, কিন্ত আগুন পাওয়া যাবে না। মাথা আঁচড়ানোর চিরুনি রাখা যাবে, আয়না নয়। জামাকাপড় সেলাইয়ের জন্য সুতো পাওয়া যাবে, সূঁচ দেওয়া হবে না। বন্দিদের কাছে ধারালো কোনো কিছু রাখার নিয়ম ছিল না, যা দিয়ে তারা নিজেদের বা অন্যান্যদের আঘাত করতে পারে। এরকম এক ঘটনা ঘটে শান্তা নামে এক বন্দির সঙ্গে। শান্তার কাছে একটা নেলকাটার ছিল। এই যন্ত্রটা দিয়ে সে তার বাচ্চাদের নক কেটে দিত। একদিন এই জিনিসটার প্রতি নজর পড়ে এক ওয়ার্ডারের। কিন্তু শান্তা যন্ত্রটি দিতে রাজি না হলে তার উপর অমানবিক অত্যাচার চলে। "পরদিন ভোরে অন্য সব ওয়ার্ড খুলবার আগে, ছুরি বের করে না দেবার অপরাধে চার আর তিন বছরের কাঁদতে ভুলে যাওয়া বাচ্চাদের বিস্ফারিত চোখের সামনে তাদের মাকে বিবস্ত্র করে, হাতে শিকল বেঁধে টাঙিয়ে দেওয়া হল একটা সেলের মধ্যে। কিছু করার ছিল না, শুধু দাঁতে দাঁত চেপে দরজায় একটা লাথি মারা আর গরাদের মধ্যে দিয়ে বাচ্চা দুটোকে বুকে চেপে ধরা ছাড়া। ..."[২৪]

জেলের মুদ্রা ছিল বিড়ি। যাদের বেশি ক্ষমতা থাকে অর্থাৎ যারা ওয়ার্ডারের পোষ্য, তাদের হাতে থাকে বিড়ি। জেলের মধ্যে অনেক বন্দিরাই বিড়ি ভেঙ্গে মশলাটা দোক্তার মত করে খেয়ে নেশা করত। এদের প্রায় সবাই ভেতরে আসার পর নেশা শুরু করেছে। এই নেশার দাসত্বের সঙ্গে সঙ্গে জেলে রাজত্ব করে নানা কুসংস্কার। এইসব কারণে বন্দিদের নিজেদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি, চুলোচুলি চলতে থাকত। যদি ঘর মোছার সময় কেউ বসে থাকে, তাহলে তার চারদিক

ঘুরিয়ে মুছে নিলে বন্দিদের মধ্যে চলতে থাকত মারামারি। ফলে "বদ্ধতা এদেরকে শিখিয়েছে চিন্তা-ভাবনাকে অস্বাভাবিক করে তুলতে।"[২৫] এইভাবে ঘেরার পাঁচিল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে থেঁতলে দিয়েছে। জেলের মধ্যে একটি অবলম্বনকে নিয়ে একটি মেয়ে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে- সেটা হল তার বাচ্চা। অনেক সময় "কোনো মানসিক সংশোধনের জন্য এইসব 'সংশোধনাগার' থেকে মানবিক সমস্ত অবলম্বন ছিঁড়ে নেওয়া হয়।"[২৬]

জেল হল একটা বড়সড় সমাজের একটা ছোট সংস্করণ। সেই সমাজের রীতি-নীতি সবকিছুই আলাদা। তাই সাঁওতাল সমাজ থেকে উঠে আসা বুধার জীবনে সামাজিক রীতিনীতি বদলে যায়। "তার পৃথিবীতে অর্থহীন ও অস্তিত্বহীন এক সংবিধানের অধীনে তার সম্পূর্ণ অবোধ্য এক ভাষায় এবং তার বোধের সম্পূর্ণ বাইরে স্থিত অপরাধে তার বিচার হয়ে গেল। যে রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব, কোনো ভূমিকা তার কিংবা তার গ্রামবাসীদের জীবন ধারণে কখনও ছিল না, বুধার জীবনের কুড়িটি বছর কেড়ে নেবার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সেই রাষ্ট্র দেখা দেয়। যাদের বেঁচে থাকবার অধিকারের ক্ষেত্রে সমান অধিকার অলীক ঠাট্টা তাদের দন্ডবিধানের ক্ষেত্রে আইন, দণ্ডবিধির সমতা।"[২৭] সমাজ-রাজনীতির অনেক সমীকরণই গোলমাল করে দেয় জেলের নানা গল্প। তাই "এখানে যারা থাকে তারা সবাই অপরাধী, প্রমাণিত অপরাধী। সামাজিক স্বাস্থ্যের পোকা বাছাই করে তাদের এখানে রাখা হয়েছে।"[২৮]

জেলে যারা একবার পাগল হয়ে যায় তারা আর ভালো হতে পারে না। কারণ তাদের ভালো হতে দেয় না জেল কর্তৃপক্ষ। 'পাগল ছিল' এই ধারণা সহ্য করতে করত তারা পাগল হয়ে যায়- "... এক উদভ্রান্ত অসহায় আমার দম আটকে আসে, যখন দেখি, আমাদের অপার নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ঘেরা, এমন কি বেশ শালীন সংস্কৃতি-মার্জিত পরিবেশেও, পাগলমাত্রেই হল হাসি ও বিদ্রূপের খোরাক নয়ত- বিতৃষ্ণার!"[২৯]

জেলের ভেতর জেল

মীনাক্ষী সেন রচিত *জেলের ভেতর জেল* সরাসরি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। ভারতীয় জেল-জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য ও সত্য ঘটনা ভিত্তিক স্মৃতি-বিস্মৃতিমূলক রচনা। তাঁর লেখা জেলের ভেতর জেল গ্রন্থের প্রথম পর্বে যে স্মৃতিকথা লিখেছেন, তা রচিত হয়েছিল পাগলবাড়ির আবর্তিত জীবনকে কেন্দ্র করে। জেলের ভেতর জেল গ্রন্থে প্রধানত যাদের কথা বিবৃত হয়েছে, তারা পাগলবাড়ির বন্দি; তারা কেউ পাগল, কেউ আধপাগল, কেউ বা আদপেই পাগল নয়। এই বন্দিদের জেলে কর্তৃপক্ষ দুই ভাগে ভাগ করেছে। যথা- N.C.L. অর্থাৎ নন ক্রিমিনাল লুনাটিক আর C.L. অর্থাৎ ক্রিমিনাল লুনাটিক। বাংলায় তর্জমা করে বলা যায় নিরপরাধী পাগল আর অপরাধী পাগল।

মীনাক্ষীর লেখার মধ্যে শুধু পাগলবাড়িতে আটক হতভাগ্য মেয়েদের কথাই নেই, রয়েছে জেলখানার প্রায় সবিস্তার বিবরণ। জেলের মধ্যে নিয়মের কাঠামো থাকলেও সে নিয়ম মানার কোনো কারণ নেই, বরং জেলখানার কর্তা থেকে মেট্রন, ওয়ার্ডেন পর্যন্ত নিজেদের মত নিয়ম ঠিক করে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মীনাক্ষী সেন লিখেছেন- "জেলে তো পাগলরা ডাক্তার বা সেবিকাদের তত্ত্বাবধানে বাস করে না, করে জমাদার ওয়ার্ডার ও অন্যান্য কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে। তাদের কাজ বন্দীদের আটক রাখা, জেলের লিখিত ও অলিখিত আইন বজায় রাখা। যাতে জেলের সব ব্যবস্থাই সব বন্দী মেনে নেয় শব্দহীনভাবে, যাতে কেউ পালিয়ে না যায়, কেউ গারদ না বাঁকায়। কাউকে শরীরে বা মনে সারিয়ে তোলার দায়িত্ব জেলের কর্মচারীদের আছে- এমন হাস্যকর কথা কেউ স্বপ্নেও ভাববে না।"[৩০] এই জন্যই জেলের মধ্যে পাগলবাড়ি, সাধারণ ওয়ার্ড, অসুস্থ রোগিনীদের ডায়েটে যদি লেখা থাকে পাউরুটি, দুধ ডিম, মাখন, চিনি, কলা- সেসব কিন্তু ওয়ার্ডের ভেতরে ঢুকেই আবার অদৃশ্য হয়ে যায় চোখের আড়ালে, আর বন্দিনীরা খেতে পায় "এক ডাবু ভাত, একটু আলুসেদ্ধ, এক ডাবু ডাল, এক ডাবু তরকারি।"[৩১] জেলখানায় মানুষকে

রাখা হয় আর তার ভেতরে নিত্যদিন সহজ স্বাভাবিক ভাবে একের ভোগ্য অন্যের পেটে যায়, বাণিজ্য হয়।

পাগলবাড়ি আর মহিলা ওয়ার্ডের কথা লেখার সময় মীনাক্ষী কোনো কথাই বাদ দিতে চাননি। তিনি যা দেখেছেন, তাঁর যা অভিজ্ঞতা- খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তা বর্ণনা করেছেন, আর প্রশ্ন তুলেছেন জেলের নিয়ম-কানুনের উপর এবং জেলের সমস্ত কদর্যতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন। এরকম পরিস্থিতিতে পাগলবাড়িতে মেয়েদের স্বাভাবিক সুস্থ মনটিকে বাঁচিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে। "এখানে, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তের চেষ্টায় পরস্পরকে ভালোবেসে, পরস্পরের হাত ধরে আমরা আয়ত্ত করেছি বন্দীশালায় সুস্থ মনে বেঁচে-থাকার জীবন পদ্ধতি। ... এসব কিছুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, অশুভ অনুভূতিকে দু-হাতে ঠেলে সরিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে চেয়েছি সুস্থ মনে। বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছি আমাদের জীবনের মহৎ আর শুভ অনুপ্রেরণা।"[৩২] তরঙ্গহীন, হতাশাগ্রস্থ, ভবিষ্যতহীন বন্দিরা জেলের মধ্যে প্রতিরোধের সংস্কৃতি জোরদার করতে পারে না। কারণ তারা বন্দি। "... ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও তাদের প্রতিবাদ করার সুযোগ কই? তারা যে বন্দী। এ অবস্থায় যে কোনো প্রতিবাদের মারাত্মক সব শাস্তি হয়। নির্মম প্রহার, অথবা সেই সেলেই বন্ধী হয়ে থাকা, কিংবা সেলবাস ও প্রহার দুই-ই একসাথে। অর্থাৎ চার দেওয়ালের মধ্যে প্রতিকারহীনভাবে দিনের পর দিন আরও অত্যাচারিত হওয়া। ক'জনই বা তার মুখোমুখি হতে সাহস পায়।"[৩৩] তবুও সাধারণ বন্দিরা প্রতিবাদ করে। সাধারণ বন্দিদের শুধু অত্যাচারিত হওয়ারই ইতিহাস নয়, তারাও কখনও কখনও এককভাবে বা যৌথভাবে গড়ে তোলে প্রতিরোধ। সত্তরের নকশাল বন্দিদের, সাধারণ বন্দিদের এসব প্রতিরোধের কাহিনি মীনাক্ষী লিপিবদ্ধ করেছেন- "জ্ঞান হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত"[৩৪] মার খেয়েছে, ডিগ্রী ঘরে বন্দি থেকেছে এবং শেষে পাগল ওয়ার্ডে বন্দি হয়েছে। সহ বন্দিনীর ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সাধারণ বন্দিনী মিতা তার কুড়ি জন সহবন্দিনী নিয়ে নকশাল বন্দিনীদের সঙ্গে প্রতিরোধ আন্দোলন করেছে। তাই

জেলে শুধু অত্যাচারই নেই, কখনও কখনও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ বন্দিদের মধ্যে প্রতিরোধও উঠে আসে। তবে এই প্রতিরোধের কোনো সাংগঠনিক রূপ নেই। বাইরের সমাজের মতো জেল সমাজেও আছে সংগ্রাম, অন্যদিকে মানসিক রোগগ্রস্ত সহবন্দিকে সেবা করেছে সাধারণ বন্দিরা। এসব দেখে সত্তরের এক বন্দিনীর মন্তব্য- "এই বন্দিনীরা, যাদের কোনো আদর্শবাদ নেই, যারা কোনো রাজনীতি করে নি, যাদের জীবন-ইতিহাস শুনলে দেখা যাবে সমাজ বা ব্যবস্থার কাছে সুবিচার সহৃদয়তা কিছুই পায় নি, কাছে থেকে দেখলে চোখে পড়বে মানুষ হিসাবে যাদের অনেক দোষ, তারাই অমানবিক ব্যবস্থায় বন্দী থেকেও, কী ক'রে ধরে রাখে এই সব মানবিক মূল্যবোধগুলি? এত মায়া-মমতা তাদের মনে কোন উৎস থেকে আসে?"[৩৫]

একদিকে যেমন মায়া-মমতা অন্যদিকে তেমনি জেল প্রতিষ্ঠান নিজেই গড়ে তোলে এক নিষ্ঠুর, অমানবিক জেল সংস্কৃতি। সাধারণ বন্দিকে দিয়ে বন্দি শাসন, শোষণ আর পেটাইয়ের জেল সংস্কৃতি শুরু জেলের জন্ম থেকেই। কোন রাজনৈতিক ঢেউ থামাতে পারেনি এই অপ্রতিরোধ্য গতি। জেলে মীনাক্ষী চার বছর ধরে শুধু অকথ্য অন্যায় দেখেননি, প্রতিবাদ করেছেন, শাস্তি পেয়েছেন, তবু নির্যাতিতাদের পাশ থেকে সরে যাননি। মীনাক্ষী জেলের ভেতর অসংখ্য চরিত্রের সমাহারে এক আশ্চর্য আখ্যান তৈরি করেছেন তাঁর লেখার মধ্যে। "যাদের কারাবাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজনীতি, আত্মত্যাগ, কষ্টস্বীকার এবং সামাজিক অন্যায়ের অবসানের প্রসঙ্গ- তাদের যে নামেই ডাকা হোক- যে অবস্থার মধ্যেই তাদের জেলে ফেলে রাখা হোক- জেলজীবনকে মোকাবিলা করার পদ্ধতি তাদের আলাদা। তাদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ-বিকর্ষণ; বিরাগ-অনুরাগ, শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধাও অনেক বেশী তীব্র হওয়ারই কথা। আর তেমনটাই হয়ে থাকে সাধারণত। সেই বিচিত্র বর্ণময় সোচ্চার চরিত্রের ভীড়ে তাদের জীবন-পদ্ধতি আপাত-আকর্ষণীয় বর্ণনায় হয়তো হারিয়ে যেতে পারে আপাত বর্ণহীন-রঙহীন চরিত্রগুলি; অথচ তাদের নিয়েই আমি লিখতে চেয়েছি জেল-জীবন বর্ণনার প্রথম পর্ব।"[৩৬]

পাগলামির শ্রেণি বিভাগ অনুযায়ী জেলের মধ্যে বদ্ধ ঘরে আটকে সমাজের শান্তি রক্ষা করা হয়েছে। পাগলবাড়িতে বন্দি মেয়েরা কেমন করে বেঁচে থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়- "... হাতে বা পায়ে বেড়ি দিয়ে লোহার গরাদের সাথে বেঁধে রাখা হয় কিছু অবয়বকে। অন্য এক ঘরে প্রায় শ-দুয়েক উন্মাদের সহবাস। তার ভেতরে আধা সুস্থ বা সম্পূর্ণ উন্মাদের সঙ্গে নাকি রয়েছে অনেক প্রায় সুস্থ বা সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষরাও। কি শীতে কি গ্রীষ্মে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ তরুণী, বৃদ্ধা বা মাঝবয়সী কিছু শরীর। তারা কেউ চেঁচায়, কেউ হাসে, কেউ বা কাঁদে। কেউ আবার কামড়ে খুবলে নেয় অন্য কোনো সহবন্দিনীর এক খাবলা জীবন্ত মাংস। কেউ বসে-বসে যেন তৃপ্তি নিয়ে চিবিয়ে খায় অন্য কারো আঙুল। এইখানে, এভাবেই নাকি পাগলদের শোধন বা সুস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জায়গাটিরই নাম 'পাগলবাড়ি'।"[৩৭] পাগলাগারদ পরিচিত পরিবারের বাইরে এক কাল্পনিক পরিবার তৈরি করে। সেখানে নিজের পরিবার দায় মুক্ত করে বাঁচে। যদিও পাগলা গারদের উদ্ভাবন তথাকথিত ভদ্র মানুষ এবং শৃঙ্খলাযুক্ত রাষ্ট্রের পক্ষে এক জরুরি ব্যাপার। জেল কর্তৃপক্ষের চোখে অবাধ্য বন্দিদের আটক রাখার নিয়ম তৈরি করে। পাগলাগারদকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইতিহাস ও বিবর্তনের বাইরে স্বতন্ত্র হিসাবে দেখা যায়। মীনাক্ষী হতভাগ্য মানুষগুলিকে কলমের তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন- "সেই নিস্তব্ধতা টুকরো-টুকরো ক'রে শোনা গেলো কয়েকটি তীব্র, তীক্ষ্ণ গলার চিৎকার- "ধর-মার-ধর-পাগলীটাকে-মার-" সেই চিৎকারের উৎস অনুসন্ধান ক'রে দেখা যায়, কয়েকটি মেয়ে তাড়া করেছে একটি কঙ্কালকে। একটি জীবন্ত কঙ্কাল। চামড়ায় ঢাকা হাড়। লম্বা সরু হাত দুখানি আকাশের দিকে তোলা। আঙুলগুলি ছড়ানো। মাথার চুল তিনটে জটার আকার নেমে এসেছে ঘাড়ে।"[৩৮] জেলখানার কঠোর বাস্তবতা জেলখানার বন্দিদের নানাভাবে অভিজ্ঞ করে তোলে। কিছু কিছু ক্ষত মানুষের মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। এমনকি সেই ক্ষতের দাগ কখনো ওঠে না। জেলে শাহনাজের উপর চলে ছিল এরকম নিষ্ঠুর অত্যাচার। যদিও মৃত্যুর সঙ্গে অসম যুদ্ধে সে জয়ী হয়েছিল- "মৃত্যুপথ থেকে

সদা ফিরে-আসা কিশোরীকে আবার মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে দেবার মত প্রহার করতে পারে জেলখানা- 'রক্ত চাই, মুণ্ডু চাই' চিৎকারে আমাদের স্বাগত জানিয়েছিল যে জেলখানা- সেই হিংস্র ও বিকৃত জেলখানায় পৃথিবীর সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের কণ্ঠস্বর বহন ক'রে সেই কিশোরীই তো প্রথম এসেছিলো।"[৩৯]

জেল কর্তৃপক্ষের কৃপার অন্নে বিশেষভাবে লালিত-পালিত ছিল যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা। জেলের নিয়মে সাজা-পাওয়া বন্দিরা শুধু 'মেট' হতে পারত। বন্দিদের খাওয়া, চিকিৎসা ও ওষুধ সব বিলি বন্টনের দায়িত্ব থাকত মেটদের উপর। এই মেটরাই ধীরে ধীরে জেলের মধ্যে অত্যাচারী শাসকে পরিণত হয়। এরাই পরে সাধারণ বন্দিদের উপর অত্যাচার করে। এক্ষেত্রে মেট্রন বা ওয়ার্ডারের সম্মতিক্রমে তারা এ কাজে লিপ্ত হত। কারণ কোন বন্দিকে কর্তৃপক্ষ সরাসরি মারধোর করত না। যদি কখনো কেউ মারা মারা যায়, তখন সেই মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে কর্তৃপক্ষ। এটা হল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারে ভিন্ন মাত্রা। "প্রহার সমানে চলছে। অথচ কখন বন্ধ হয়ে গেছে শাহানাজের ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে দয়া ভিক্ষা। ... শিখা তার মুখখানা উপড়ে টেনে তোলে। তারপর মুখের ওপর লাগায় কয়েকটা চড়। ... দেখলাম হাতের চেটো দিয়ে নাক মুছতে মুছতে সে দিকে চেয়ে আছে শাহানাজ। অবাক হয়ে? একটু পরেই গলগল করে রক্ত বের হয়ে এলো তার নাক দিয়ে। উপুড় হয়ে চাতালের উপর পড়ে গেল সে। ... মানতেই হয় শাহানাজ এক পাগল। আর তার পায়ে দূষিত ক্ষত তৈরি হয়েছিলো যাদের নিষ্ঠুর অবহেলায়, যারা তাকে মারল, মার খাওয়ালো, তারাই সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানুষ। এত সুস্থ যে জেলে-আটক শত-শত বন্দি-বন্দিনীর তারাই শাসনকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক।"[৪০] পাগলদের জন্য জেলের ভেতর কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। পাগলবাড়িতে বন্দিদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রগুলি ছিল চিৎকার, গর্জন, দাপাদাপি। ফলে জেলখানা দিনরাত নিত্য নতুন অভিজ্ঞতায় ভরে থাকত। মানসিক ভারসাম্যহীন বন্দিদের বিনা চিকিৎসায় ঠেলে দেওয়া হত চিরকালীন অন্ধকারের দিকে।

"লোহার হ্যান্ডক্যাপ বেঁধে লোহার গরাদের সঙ্গে আটকে রেখে পেচ্ছাপ পায়খানার মধ্যে ফেলে রাখাটা উন্মাদদের 'চিকিৎসার' ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট 'শক্-থেরাপি' বলে আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে। উন্মাদ-পাগলদের চিকিৎসার জন্য এটিই জেলে সর্বাধিক চালু ব্যবস্থা। ... বুঝলে মাসীরা, এইভাবে রাখে বলেই অনেকের পাগলামি একদম সেরে যায়। আদর-আদর ক'রে রাখলে আর সারতে হত না।"[৪১] এর থেকে যদি কোনো মানবিক পরিবেশে বা কোনো মানসিক চিকিৎসালয়ে পাগল বন্দিরা থাকত, তাহলে ভালো কোনো মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বাবধানে তারা সুস্থ হয়ে উঠতে পারত। তবে এসব নিয়ে জেলখানায় কেউ মাথা ঘামায় না। "জেলে তো পাগলরা ডাক্তার বা সেবিকাদের তত্ত্বাবধানে বাস করে না, করে জমাদার ওয়ার্ডার ও অন্যান্য নানান কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে। তাদের কাজ বন্দীদের আটকে রাখা, জেলের লিখিত ও অলিখিত আইন বজায় রাখা। যাতে জেলের সব ব্যবস্থাই সব বন্দী মেনে নেয় শব্দহীনভাবে যাতে, যাতে কেউ পালিয়ে না যায়, কেউ গরাদ না বাঁকায়। কাউকে শরীর বা মনে সারিয়ে তোলার দায়িত্ব জেল কর্মচারীদের আছে- এমন হাস্যকর কথা কেউ স্বপ্নেও ভাববে না।"[৪২] যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সরল-সহজ বন্দিদের 'মেট' তৈরি করার জন্য নানা প্রলোভন দেখায় জেল কর্তৃপক্ষ। ফলে জেলখানার নিয়ম হল- "শাস্তি পাওয়া বন্দিনীরা মেট হয়ে সুপার, জেলার, সেপাই শন্ত্রীর ডান হাত বাঁ হাত হবে। যে যতো গুরুতর অপরাধ করেছে বলে আদালতে প্রমাণ হবে- যে যতো বেশী কঠিন সাজা পাবে- জেলখানাতে তার খাতির হবে ততো বেশি।"[৪৩]

পাগলবাড়িতে তৃতীয় শ্রেণির বাসিন্দা হল যারা পাগল নয় বা কোনোদিন পাগল ছিল না এমন সব বন্দিরা, কিন্তু কর্তৃপক্ষের রোষদৃষ্টির শিকার হয়ে পাগলবাড়িতে তারা নির্বাসিত। পাগলদের সঙ্গে থাকতে থাকতে সেই ভয়ানক পরিবেশ হয়তো একদিন তাদেরকে সত্যিই পাগল করবে। এই ধরনের বাসিন্দারা হল আসগরি, শাহানাজ, ক্ষীরোদা এবং সুফিয়ামাসি। এইসব বাসিন্দারা যখন জেলের ভেতর মারা যায়- "মৃতদেহগুলিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হতো। মৃত্যুর

আগে তাকে যে যথাযথ চিকিৎসায় রাখা হয়েছিল তার বিবরণ নথিপত্র করার জন্য, আর স্বাভাবিক মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেয়ার জন্য। কে জানে কোন রোগের নাম লেখা থাকতো সে সব সার্টিফিকেটে। কিন্তু হাসপাতালের মেঝেতে যখন ফেলে রাখা হোতো মৃতদেহগুলিকে খুব কাছ থেকে দেখেছি- সুস্থ, আধা-সুস্থ, উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ- যে কেউই মারা গিয়ে থাক- তার শরীরে অবশিষ্ট আছে শুধু হাড় আর চামড়া। যেন কোনো রক্তচোষা শুষে খেয়েছে তার শরীরের সব রক্ত, এমন কি মাংসও।"[৪৪] উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত পাগলের সঙ্গে এমন বন্দিরাও রয়েছে যারা মানসিকভাবে অস্বাভাবিক হলেও উন্মত্ত নয়। এভাবেই ওরা খাঁচার বন্দি হয়ে থাকে। "অপরাধী ব'লে অভিযুক্ত পাগল আর নিরপরাধ পাগল, শান্ত অথবা হিংস্র প্রকৃতির পাগল, চিৎকার-চেঁচামেচি করা অথবা নীরব নিশ্চুপ বসে থাকা, সিজোফ্রেনিক অথবা প্যারানয়েড, ম্যানিয়াক কিংবা লুনাটিক, সবাই এখানে এইভাবে বন্দী রয়েছে খাঁচায়।"[৪৫]

অজস্র শিশুমুখ মীনাক্ষীর জেল জীবনে আলো করে ফুলের মতো ফুটেছিল। জেলবাসী এইসব শিশুদের গলা খুলে কথা বলার অধিকার ছিল না। কারণে বা সাধারণত অকারণে নির্মমভাবে প্রহৃত হওয়াটাই ছিল তাদের অভ্যাস। সেই অসহায় শৈশবহীন শিশুরা হঠাৎ করে অনধিকার অধিকার পেত- অসহায়ভাবে বন্ধ এক পাগলিকে খ্যাপানোর অধিকার। এই অধিকার শিশুরা নিষ্ঠুর আনন্দে প্রয়োগ করত। কিন্তু সেই খেলা নির্মম তার রূপ নিয়ে আঘাত করত ক্ষীরোদাকে। "পাগলদের ক্ষ্যাপানো তো এক পরিচিত খেলা। শুধু এই বন্দী জীবনে নয়- বাইরের জগতে বাচ্চাদের সাথে বয়স্কজনরাও সপ্রশ্রয় ও কৌতুকে যোগ দেয় সে খেলায়, এমন দৃশ্য নিতান্ত বিরল নয়। আর এ তো জেলখানা। এখানে সব অন্যায় কাজই পায় এক অন্য নিষ্ঠুর মাত্রা।"[৪৬] শিশুদের নিয়ে জেলের মধ্যে মজার খেলা আবিষ্কার করে মহিলা ওয়ার্ডার, যিনি ছিলেন জেলের ভয়ানক অত্যাচারী হিসেবে বন্দিদের ত্রাসস্বরূপ। জেলের মধ্যে শিশুদের উপর অকল্পনীয় অত্যাচার চলত। এই অত্যাচারের সীমা কতদূর পৌঁছে যেত তা কল্পনা করা অস্বাভাবিক। জেলের ভেতর

জেল বন্দিনীদের আর শিশুদের শরীর আর মনের ওপর আধিপত্যের রাজনীতিকে নগ্ন করে দেখায়।"সে স্বয়ং এসে নিয়ে যায় সবুরজানকে। তারপর নিয়ে আসে বছর ছয়-সাতেকের হারিয়ে যাওয়া আর এক শিশুকে। তার দুর্ভাগ্য সে শিশু হলেও ছেলে। তাদের দুজনকে মুখোমুখি বসিয়ে তারা জোর ক'রে ছেলেটির যৌনাঙ্গ ঢোকাতে চেষ্টা করতে থাকে সবুরজানের শরীরে। ... বছর চার-পাঁচ বয়সের এক শিশু। বছর ছয়-সাতেকের আরেক শিশু। ... ভয়ে, আতঙ্কে, মর্মান্তিক চিৎকার ক'রে কাঁদছিল শিশু দুটি। ভয়ানক ব্যথা লাগছিলো তাদের। তারা যতো কাঁদে, ততোই ওরা জোর ক'রে ব্যথা দেয়- আর হো-হো হাসিতে হাততালিতে ফেটে পড়ে। স্বয়ং ওয়ার্ডার দাঁড়িয়ে ঘটনাটি ঘটাচ্ছিল।"[৪৭] এই জেলখানায় সবই সম্ভব। জেলের মধ্যে সর্বত্র নিপীড়ন আর অত্যাচার ছড়িয়ে রয়েছে। বন্দিদের ডিগ্রী ঘরে রেখে শাস্তির নতুন মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। আত্মহত্যার চেষ্টা তো আইনের চোখে অপরাধ। আর জেলের মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে জেলের আইনেও দোষীদের জন্য শাস্তি বরাদ্দ আছে। প্রথমত, আত্মহত্যাকারীর খাবার বন্ধ করে দেওয়া; দ্বিতীয়ত, ডিগ্রী ঘরে আটকে রাখা এবং তৃতীয়ত, তার জামা কাপড় খুলে নেওয়া। নিরাপত্তার এই অভিনব পদ্ধতিতে মহিলা ওয়ার্ডের বন্দিনীদের আটকে রাখার ব্যবস্থাটা ছিল একদম নিখুঁত। "অপরাধীদের শাসনকর্তাদের অপরাধী-দমনের হরেক শাস্তির মধ্যে এও এক শাস্তি। শীতবোধ, লজ্জাবোধ, অপমানবোধ- এইসব বোধেই তীব্রভাবে এখনও বর্তমান যে রমণীর মধ্যে, তাকে শীতের রাতে উলঙ্গ করিয়ে ডিগ্রীঘরে ফেলে রাখা হলো এই সভ্য দেশের সভ্য জেলখানায় এক সভ্য শাস্তিদেবার পদ্ধতি।"[৪৮]

"এই জেলখানা বড় খারাপ জায়গা। বদ্ধ জলার মতোই এখানে ব্যাধির জীবাণু থিকথিক করে।"[৪৯] এছাড়া মিথ্যে কথা, চুরি ছ্যাঁচরামি, ঝগড়া-ঝাঁটি, মারামারি এবং সমকামী ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি জেল জীবনের ব্যাধি বলে গণ্য হয়। জেলের মধ্যে বন্দিরা চিঠিপত্র লেখালেখি, চালাচালি অবাধেই করতে পারে। কিন্তু প্রায়ই ওসব বিষয়ে বন্দিদের নিজেদের মধ্যে হিংস্র বিরোধ বেধে

যায়। সাধারণ বন্দিরা এই চিঠির মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করে করে ছেলেদের ওয়ার্ডে। এখানে বন্দি মেয়েরা পুরুষ-সঙ্গ বর্জিত। আবার ছেলেদের ওয়ার্ডে সেই বন্দিদেরও একই অবস্থা। মহিলা বন্দিদের কাছে পুরুষ বলতে শাসনকার্য পরিচালনার প্রতীক- জমাদার বা সেপাই আর সপ্তাহের শেষে ওয়ার্ড পরিদর্শনকারী জেলার, সুপার এবং ডাক্তার। জেল বন্দিদের ব্যক্তিগত চিঠি কর্তৃপক্ষের হাতে দিতে হত। কিন্তু কোনো গোপন চিঠি পাঠানো ছিল যে জেল আইনে অপরাধ। পুরুষ মেটদের উপর দখল নিয়ে বন্দিদের মধ্যে মারামারি লেগেই থাকত। "হৃদয়ের তাগিদ নয়, পাশবিক জৈবিক তাগিদই বড়ো হয়ে ওঠে, পশুর মতো হিংস্রতায় তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়তে থাকে। ... ক্ষমতাধর বন্দিনীদের নিজেদের মধ্যেকার লড়াই।"[৫০] অনেক সময় বন্দিদের নিজেদের মধ্যে বিশেষ প্রতিহিংসা জেগে উঠত। এ রকমই মীরার প্রতিহিংসা জেগে ওঠে শোভার ওপর- "নিরপরাধ হারিয়ে-যাওয়া মীরাই সেই কোন ছোট বয়স থেকে জেলে বড় হয়েছে। বহুদিন ধ'রে জেল মীরাকে বহু দুঃখ দিয়েছে। জেলে বড় হয়ে-ওঠা শিশুরা যেমন নির্মমতা সহ্য করে, সে-ও তা সবই সহ্য করেছে। এখন কিছুদিন ধরে একটু ভরপেট খাদ্যের আশায়, পুরুষসঙ্গের লোভে আর প্রহার ও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, ক্ষমতাবানদের হয়ে কাজ করতে রাজী হয়েছে সে। যে যন্ত্রণা জেল তাকে এতোদিন দিয়েছে- সেই যন্ত্রণাই সে আজ তার চেয়েও অসহায় বন্দিনীদের ফিরিয়ে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।"[৫১]

জেলের কাছেই ছিল পতিতাপল্লী। মহিলা ওয়ার্ডের অন্দরমহলের সঙ্গে তাদের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। তারা সুস্থ হয়ে ওঠা ঠিকানাহীন পাগলদের বের করে নেবার কলা-কৌশল জানত। জেলের থেকেও কঠিন জেল এই পতিতাপল্লী। কোন মেয়ের পক্ষে এখানে ঢোকার রাস্তাটা হত খানিকটা প্রশস্ত, কিন্তু বের হবার রাস্তাটা ততটাই দুর্গম ছিল। নকল অভিভাবক সাজিয়ে বন্দিদের বাইরে নিয়ে গিয়ে সোজা পতিতাপল্লীতে তোলা হত। তাই বন্দিদের সুস্থ হয়ে ওঠার পরও জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন রাস্তা ছিল না। সমস্ত মহিলা ওয়ার্ড জুড়েই জাল

ছড়িয়ে ছিল। "বলপূর্বক ধর্ষিতা হলে বা অনিচ্ছায় দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হলে নিজেকে অপরাধী ভাবতে অভ্যস্ত এদেশের মেয়েরা। পরিবার আর সমাজও তো ধর্ষকদের বদলে ধর্ষিতাকে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে জেলখানায় জীবন কাটাতে বাধ্য করে।"[৫২]

লালবাজারে ৬৪ দিন

মলয়া ঘোষের *লালবাজারে ৬৪ দিন* বইটি সাতের দশকে পুলিশি নির্যাতনের প্রামাণ্য দলিল স্বরূপ। তাঁর লেখায় নিজের জেলজীবনের নিপীড়নের ইতিহাস সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখায় অত্যাচারের মাত্রা এত বেশি পরিমাণে বর্ণিত হয়েছে যা আমাদের মনে হয় পায়ের তলায় দেশ নামে, পৃথিবী নামে কোনো মাটি নেই। মলয়া ঘোষ প্রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িককালে জন্মগ্রহণ করেছেন। এরপর বাংলার দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৭- এর দেশভাগ ইত্যাদি সমস্ত কিছুর বাতাবরণে তাঁর শৈশব কেটেছে। উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়ে মলয়া দেশভাগের পর খুলনার রাড়ুলি গ্রামে ছেড়ে পরিবারের সঙ্গে শৈশবেই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। তখন কৈশোরের সেই দিনগুলোর নানা প্রশ্ন তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে- "কেন এমন সব ঘটল? কারা এই দুর্বিপাকের জন্য দায়ী? দেশভাগ? আমরা তো চাইনি। কাদের খেয়ালে আমাদের মত সাধারন মানুষের জীবন এলোমেলো হয়ে গেল?"[৫৩]

সাতের দশকের শুরুতে যে রাজনৈতিক মতবাদের ঢেউ পশ্চিমবঙ্গের উপর বয়ে গিয়েছিল তাতে মলয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি রাজনৈতিক জীবনে পা রাখতে শুরু করেন। লালবাজারে দীর্ঘদিন লকআপে থাকার পরবর্তী সময়ে সেই নারকীয় অত্যাচারের ইতিহাসের কথা তাঁর মনের মধ্যে সবসময় নাড়া দিত। তাই তিনি বলেছেন- "লক-আপের সেই বীভৎস দিনগুলোর স্মৃতি আমার স্মৃতির কুঠুরিতে দগদগে ঘা হয়ে বেঁচে থাকবে আজীবন।"[৫৪] কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পথ চলে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করেছিলেন

মলয়া। সচেতন নাগরিক হিসাবে নানা সামাজিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে মে মাসে নীলরতন সরকার হাসপাতালের করিডোরে পুলিশ তাঁকে অ্যারেস্ট করে, কোনোরকম সরকারি নির্দেশপত্র ছাড়াই। তাঁর বিশ্বাস ছিল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়া এমন ভাবে কাউকে বিনা অপরাধে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে না। কিন্তু কোনোরকম সরকারি নির্দেশপত্রকে তোয়াক্কা না করে জনসমক্ষে একজন নারীর প্রাথমিক অত্যাচারের পর্ব শুরু হয়ে যায়। অত্যন্ত অশালীন ভাবে আঁচল ধরে টেনে তাঁকে গাড়িতে তোলার সময় মলয়া বলেছেন- "আপনারা এত মানুষের সামনে আমায় হেনস্থা করছেন কেন?... আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কারণ দেখান।"[৫৫] এরপর মলয়ার সঙ্গে পাঁচ-ছ'জন লোকের ধস্তাধস্তি শুরু হয় ঘন জনারণ্যে। "ওরা আরও টানাটানি করে আমায় গাড়ির দরজায় একেবারে সামনে নিয়ে চলে এল। ওদের মধ্যে দু'জন আমাকে জাপটে ধরে গাড়ির মধ্যে ফেলে দিল। ওদের নিশ্চয়ই সরকারি নির্দেশ আছে যা খুশি করার। নইলে প্রকাশ্যে এত সাহস হয় পুলিশের। মহিলা বলে কোন বাছবিচার নেই।...ইতিমধ্যে এই ধস্তাধস্তির ফলে গাড়ির দরজাটা সজোরে পড়ল আমার হাতের উপর। এর ফলে বাঁ হাতের মধ্যাঙ্গুলির উপরের দিকের প্রথম কড়টি ভেঙ্গে ঝুলতে লাগল। বাকী আঙুলগুলো রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে তাতে।"[৫৬]

স্বাধীন ভারতের পুলিশ বাহিনী প্রকাশ্য রাস্তায় মলয়ার গায়ের কাপড় প্রায় টেনে খুলে দেয়। যেসব পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের মধ্যে দুজন মধ্যপ অবস্থায় ডিউটি করছিল। লালবাজারে আনার পর ৩০ মে ১৯৭৪ সাল, বেলা ১২ টা থেকে টানা ৬৪ দিন মলয়াকে বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়। সেই সময় কুখ্যাত পুলিশ অফিসার রুনু গুহ নিয়োগীর টর্চার চেম্বারে বীভৎস অত্যাচার মলয়ার উপর। রুনুবাবুর টর্চার চেম্বারে "শুধুমাত্র নকশাল বন্দিদের আনা হয়।"[৫৭] রুমের মধ্যে নিয়ে এসে একজন পুলিশ কর্মী হাতের ঘড়ি খুলে নিল এবং হাতের বালা খুলতে গিয়ে অশালীন রসিকতা করে বলে- "দাদা, বউকে তো তুমি শাঁখা পরাও, বৌদির বালাটা

তুমিই খুলতে পারবে।... আমাকে সেই পুলিশকর্মীরটির পায়ের কাছে বসিয়ে তার উরুর উপর আমার হাতটা রেখে শক্ত করে হাতটা চেপে ধরে বালা খুলতে লাগল। ওদের এই নিদারুণ মানসিক অত্যাচার অসহ্য মনে হচ্ছিল।"[৫৮] গ্রেপ্তারের ২৭ দিনে মাঝরাতে ওই চেম্বারে মলয়ার উপর চলে সবচেয়ে নিদারুণ অত্যাচার। এই সময় আর এক পুলিশ অফিসার উমাশঙ্কর লাহিড়ীর নির্দেশ হল- "এ যদি আগামীকালের মধ্যে এই মহিলার খবর না বলে, তাহলে কালকেই 'এর' অর্ধেক মাথা কামিয়ে চুন মাখিয়ে লালবাজার চত্বর ঘোরানো হবে।"[৫৯]

মলয়া ঘোষ তাঁর স্মৃতির কপাট খুলে অত্যাচারের যে দৃশ্য উন্মোচিত করেন, তা আমাদের কাঁপিয়ে তোলে। গ্রেপ্তারের প্রথম দিনেই মলয়াকে যেভাবে অত্যাচার করা হয় তা কল্পনা করা যায় না। "ওরা জোর করে আমায় টেনে একটা বড় টেবিলের উপুড় করে শুইয়ে দিল, আর কয়েকজন মিলে আমার হাত আর পা শক্ত করে চেপে ধরে রইল। পায়ের নীচ থেকে প্রায় গলা পর্যন্ত কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল। এরপর দু'জন দু'পাশ থেকে কোমরের নীচ থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত ভীষণ জোরে রুল দিয়ে আঘাত করে চলল।... চোখ খুলেই দেখি রুনু গুহ চুরুট হাতে আমার সামনে দাঁড়িয়ে।"[৬০] মারের চোটে তাঁর শরীর ফুলে ওঠে এবং বারবার অচেতন হয়ে পড়েন। এরপর রুনু গুহ এবং আরো অনেকে মিলে দ্বিতীয় দফায় অত্যাচার শুরু করে। "রুনু গুহ অধিনায়কের মত এগিয়ে এসে আমার চুল ধরে বিপরীত দিকের দেওয়ালে ছুঁড়ে দিতে থাকল। আর বিপরীতে দাঁড়ানো দুজন আমাকে ধরে নিয়ে আবার এপাশে ছুঁড়ে দিতে থাকল।"[৬১] মলয়া বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার তাঁর ওপর পুরোদমে অত্যাচার চলে। এ বিষয়ে উল্লেখ্য, পুলিশের অত্যাচারে পঙ্গু হয়ে যাওয়া অর্চনা গুহকে। এই নিদারুণ অত্যাচারের ফলে মলয়ার শরীর রুলের আঘাতে হাত, পায়ের আঙ্গুল রক্ত জমে নীল হয়ে যায় আর সারা শরীর থেকে রস গড়িয়ে পড়ে। নিরপরাধ মহিলার ওপর নিদারুণ অত্যাচারের প্রতিবাদে মলয়া নিজে প্রশ্ন তুলেছেন- "দেশের আইন কি একজন ব্যক্তি মানুষের

হাতে? আইনরক্ষার নামে রুনু গুহ একজন ভারতীয় নাগরিকের ওপর নৃশংস অত্যাচার তদারকি করতে পারে আর মুখে বলতে পারে 'আমিই আইন'।"[৬২] শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে পুলিশ একজন নাগরিককে দিনের পর দিন এভাবে আটকে রেখে অত্যাচার করে আসলে স্বাধীন ভারতের নাগরিকত্বকেই অপমান করে। মলয়া একজন শিক্ষিকা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতি অশালীন মন্তব্য এবং অত্যাচার করা হয়েছে। এই অত্যাচারের ফলে দেহের লক্ষ লক্ষ জীবিত দেহকোষগুলোকে ওরা মেরে ফেলেছে। সরকারি পুলিশের কি আদব কায়দা! ইন্টারভিউ চলাকালীন কয়েকজন কনস্টেবল চারিদিকে ঘিরে থাকে এবং হঠাৎ করে ওদের মধ্যে থেকে একজন রুল দিয়ে ঠিক ব্রহ্মতালুতে সজোরে আঘাত করে। তার ফলে চেতন হারিয়ে যায়।

মলয়া বারবার তাঁর লেখায় নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন করেছেন- আমি কি সমাজবিরোধী? নাকি রাজনৈতিক কর্মী? নাকি সাধারণ নাগরিক? কারণ কোন্ শ্রেণিভুক্ত সরকারের এমন অধিকার আছে যা দেহের বিভিন্ন অংশ পুলিশ দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া যায়। আর তা নাহলে লালবাজারের পুলিশকর্মীরা আইনের বাইরে গিয়ে যা খুশি অত্যাচার করতে পারার আইন কোন্ শাসকের হাতে গৃহীত হয়েছে? সেই সময়ে কংগ্রেস সরকারের রাজত্ব চলছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পুলিশের হাতে আইনকে তুলে দিয়েছিলেন। মহিলা পুলিশকর্মীর অনুপস্থিতিতেই মলয়ার শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করার প্রয়াস নিয়েছিল পুলিশি প্রশাসন। হিন্দিভাষী মহিলা ওয়ার্ডার মলয়ার অবস্থা দেখে অনর্গল পুলিশের জঘন্য কাজকে গালাগালি করেছেন। এই সমবেদনাময়ী মহিলার মতোই মলয়া লক-আপে তাঁর সঙ্গিনী যৌনকর্মী মেয়েদের ভুলে যাননি। তাঁদের কাছেও সহানুভূতি পেয়েছেন মলয়া।

মলয়াকে তখন একবারও কোর্টে তোলা হয়নি। তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে ১৫ দিনের মেয়াদে পুলিশ বারবার কাস্টডি করিয়ে নিয়েছে। প্রহারজর্জরিত মলয়াকে বিচারক একবারও

দেখতে চায়নি। বিচার ব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটূক্তি করেছেন মলয়া। সেই মুহূর্তে কংগ্রেস সরকার, বিচার ব্যবস্থা, আইন সবকিছুকেই পঙ্গু করে তুলেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। একজন মহিলার নাম থাকা সত্ত্বেও বিচারক বিচার ব্যবস্থায় কোনো সঠিক পদক্ষেপ নিতে চায়নি। "তিনি দেখলেন একজন মহিলার নাম, তা সত্ত্বেও। তিনি যদি মহিলা বন্দীকে দেখতে চাইতেন...আমার প্রতি যে আচরণ ও অত্যাচার করা হচ্ছে লালবাজার সেন্ট্রাল লক্-আপে তা তাঁর নোটিশে আনা যেত।"[৬৩]

গ্রেপ্তারের আটদিন পর (৭ জুন ১৯৭৪ সাল) সরকারি পুলিশ বাহিনী, রুনু গুহর পরিচালনায় নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়। ইতিমধ্যে মলয়ার আঘাতের জায়গায় পচন শুরু হয়েছে। "দুই হিপের উপর যেখানে ওরা কম্বল চাপা দিয়ে রক্তপাত বন্ধ রেখেছিল, কিন্তু রুলের আঘাতে আঘাতে দুদিকটা থেঁতলে দিয়েছিল, সেখান থেকে পচা-মাংস ও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, সায়া কাপড় ভিজে যাচ্ছে।"[৬৪] চিকিৎসা ব্যবস্থা শুরু হলে অজস্র ইঞ্জেকশন, কড়া ওষুধেও কিছু কাজ হয়নি। এই অবস্থায় মলয়া অসম্ভব মানসিক জোর নিয়ে অপেক্ষা করেছেন পরবর্তী কোর্টের দিনে বিচারককে সমস্ত কিছু বলবেন। কিন্তু মলয়ার সেই ইচ্ছে পূরণ হল না। তিনি দেশের প্রতি ধিক্কার এবং বিচারকের অবস্থান জানিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন- "আমাদের দেশ, বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ (!) বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা রাখা তো চাই। আইনের স্বচ্ছতা; মিথ্যার বেশাতি আর কি?"[৬৫] মলয়ার আঘাতের জায়গায় ইচ্ছে করে আবার আঘাত করতে ভালোবাসত এক কনস্টেবল। এছাড়া শরীরের পিছনে দগদগে ঘা নিয়ে কোর্টে যাওয়ার পথে সিটে বসতে না পারায় কনস্টেবল অশ্লীল ইঙ্গিত করে বলে যে- "তার উরুর উপর কাত হয়ে শুতে। ভাবুন পুলিশের স্পর্ধা!"[৬৬] মহিলা পুলিশের কেউ কেউ উগ্র হলেও কয়েকজনকে সহৃদয় মনে হয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক মহিলা সাব-ইন্সপেক্টরের স্মৃতি। তার কলেজে পড়া ছেলে লজ্জাবোধ করে যে তার মা পুলিশের কাজ করে। "যে পুলিশ, লক্-আপে মহিলাদের অকথ্য নির্যাতন করে চলেছে।"[৬৭] মলয়ার মৌন

প্রতিরোধকে ভাঙবার জন্য দিনের পর দিন নির্যাতন চালাবার পর তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখানে এসে মলয়া হয়ত প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন।

মলয়ার ওপর অকথ্য নির্যাতন শুধু ব্যক্তিগত স্তরের কাহিনি নয়, তাঁর ওপর বর্ষিত প্রত্যেকটি প্রহার পাঠকের হৃদয়ে আছড়ে পড়ে। একদিকে রাষ্ট্রশাসকদের ভ্রান্তনীতি, পুলিশিব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থার স্বৈরাচারী অমানবিকতার প্রতি ধিক্কার জাগিয়ে তোলেন মলয়া। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের বিচার বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখতে শেখান। তাই মানুষ হিসাবে, মানবী হিসেবে, স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে মলয়া বিনাবিচারে যেভাবে নির্যাতিত হয়েছেন সেই কাহিনি প্রতিমুহূর্তে সচেতনতা জাগ্রত রাখতে, মানবাধিকার ও নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে প্রেরণা দিয়েছেন। তাই তিনি বইটি সম্পর্কে বলেছেন- "পুলিশি হেফাজতে অত্যাচারের ধারা বিবরণী নয়, এই বই মানুষের প্রতি গভীর আস্থারও। পুলিশি জুলুমের মুখে দাঁড়িয়ে, অত্যাচারে রক্তাক্ত হয়েও তাঁর বিশ্বাস ও প্রত্যয় শেষ কথা বলবে মানুষ।"[৬৮]

রাজনীতির এক জীবন

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় তার জাতি-বর্ণের কাঠামোর মধ্যে দিয়ে। নকশালবাড়ি সংগ্রামের পর ভারতীয় জাতি-বর্ণ ও শ্রেণি সম্পর্কে সমস্ত কিছুই প্রশ্নের মুখে পড়ে। বিপ্লবীরা আসলে জাতি-বর্ণগতভাবে ভারতের সবচেয়ে নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছিল। ফলে নকশালবাড়ি আন্দোলন সারা ভারত জুড়ে নিপীড়িত জাতি-বর্ণের মানুষের মধ্যেও একটা জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। এই আন্দোলনকে পাথেয় করে বহু বিপ্লবী জেলে গিয়েছিলেন। "গোটা সমাজে যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি তার প্রতিফলন হল জেল।"[৬৯] সন্তোষ রাণার ১৯৭২ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৭৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত- এই পাঁচ বছর মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলই ছিল ঠিকানা। ১৯৭০-১৯৭২সালের মধ্যে জেলের মধ্যে নকশালপন্থী বন্দিদের উপর বহুনির্যাতন

হয়েছিল। জেলের ঠিক মাঝখানে ছিল সেন্ট্রাল টাওয়ার, যা জেলের ভাষায় 'গুমটি'। এখান থেকেই জেলের অভ্যন্তরীণ শাসন চলে। নিচুতলার মেট ও পাহারারা (যারা নিজেরাও বন্দি) অন্য বন্দিদের অর্থাৎ বিচারাধীন বন্দিদের উপর শোষণ ও নির্যাতন চালাত। কখনো কখনো এই শোষণ ও নির্যাতন এমন মাত্রায় পৌঁছাত যে জেলের মধ্যে মানুষ বিদ্রোহ করত। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে এরকম বিদ্রোহ ঘটেছিল ১৯৭০ সালে ১৬ ডিসেম্বর।

১৯৭২ সালে ৩০ জুন সন্তোষ রাণা বেহালার একটি বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ তাঁকে ১৪ দিন লালবাজার লক-আপে রেখেছিল। এরপর মেদিনীপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আরও ১৪ দিন পুলিশ-হেফাজতে থাকার জন্য। মেদিনীপুরে তখন এস.পি. ছিলেন নিরুপম সোম। তিনি বলেছিলেন- "আমাদের লোকেরা যে সব প্রশ্ন করবে, সেগুলোর ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন। না হলে তারা নির্যাতন করবে।"[৭০] এরপর মেদিনীপুরের ডি.এস.পি সুবোধ বসু জানতে চেয়েছিলেন যে কলকাতায় ও খড়্গপুরে যে সব মানুষ আমাদের আশ্রয় আর অর্থ সাহায্য করতেন তাদের নামের তালিকা। সন্তোষ বাবু এই বিষয়ে জানি না বলায় পুলিশ অনেক নির্যাতন করেছিল। "মাটিতে ফেলে পায়ের তলায় লাঠি দিয়ে পিটিয়েছিল। এইরকমভাবে দুদিন চলেছিল।"[৭১] সন্তোষ রাণার লেখায় জেল জীবনের অত্যাচারের ইতিহাস প্রায় নেই বললেই চলে। সেই সময়ে নকশাল বন্দি বা সাধারণ বন্দিদের উপর অত্যাচারের মাত্রা কমে এসেছিল। পরবর্তীকালে দেশব্যাপী গণ আন্দোলনের ফলেই বন্দিরা জেল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন।

জেলের গারদে জীবনের গান

জেলের গারদে জীবনের গান গ্রন্থটি অজিত চক্রবর্তীর জেল ভাঙার স্মরণীয় লড়াইয়ের কাহিনি। তাঁর লেখায় জেল জীবনের নিপীড়নের ইতিহাস খুব কম আছে। বর্তমানে জেল হয়েছে সংশোধনাগার। কিন্তু সেখানে মানুষকে সংশোধনের থেকে বেশি শোষণ করা হয়। জেল কর্তৃপক্ষ

বিনা অপরাধে বন্দিদের উপর অত্যাচার করত। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেলের সমস্ত বন্দিরা দুপুরের খাবার বয়কট করল। বন্দিরা দাবি জানাল যে কর্তৃপক্ষকে অন্যায় স্বীকার করতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে হবে। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ বন্দিদের মেজাজ আর দাবির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হল। জেলস্মৃতি থেকে শুধু সেই সময়ে রাজনীতি ও সমাজের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই না, সেই সঙ্গে যোদ্ধা মানুষের সঙ্গেও পরিচিত হই। যিনি সমাজ বদলের স্বপ্ন ধারণ করেছেন এবং সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

মজুর-কৃষক-মধ্যবিত্তের ওপর শাসক শ্রেণির অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। শাসকশ্রেণির অবক্ষয়ী ভোগবাদী সংস্কৃতির বন্যা ক্রমেই ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে মানুষ প্রতিনিয়ত ছিন্নমূল হচ্ছে, চিন্তায় ভাবনায় ভোগবাদী অরাজকতার শিকার হচ্ছে। পথ না পেয়ে শাসকদের "শান্তিপূর্ণ শোষণের আইনি"[৭২] গণ্ডি ভেঙে তারা বাঁচার চেষ্টা করছে। শাসকরা আইনি-বে-আইনি নানা উপায়ে তাদের দমন করার চেষ্টা করছে। অপরাধের ধরন পাল্টে গিয়ে জেলে নতুন নতুন ধরনের অপরাধীরা আসছে। জেলের ভেতরে ছোটখাটো গণ্ডগোলে দলবল নিয়ে ডাকাতদল বন্দিদের পিটিয়ে ঠান্ডা করত। উল্লেখ্য জেলের মধ্যে কোন ডাকাত কেসের আসামী থাকত না। অথচ ১৯৮০-র দিনগুলোতে কোচবিহার জেলে এই ডাকাত দল ছিল সর্বেসর্বা। বন্দিদের উপর জুলুমবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, আন্দোলনে সব সময় বন্দিদের সঙ্গে থাকত, পরামর্শ দিত। আবার কখনো কখনো তারা একেবারে সামনে থেকে আন্দোলন পরিচালনাও করত। কোনো বন্দিকে চিহ্নিত করার পর কর্তৃপক্ষ ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে স্বীকার করাতে না পারলেও পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে তাকে রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত করে দিত।

তথ্যসূত্র :

১. আজিজুল হক, *জেল ডায়েরী,* কলকাতা, ছাড়পত্র, আজকাল ২১, ২২, ২৩/৭/১৯৮৬, ভূমিকা

২. *মুখাবয়ব,* 'মীনাক্ষী সেন জীবন কথা আর সৃষ্টি', কলকাতা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪২১, ৩১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, দেবব্রত দেব (সম্পাদক), পৃষ্ঠা. ৬২

৩. আজিজুল হক, *কারাগারে ১৮ বছর* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৬, পৃষ্ঠা. ৯০

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৮

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৯৯

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৯১

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৯২

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩১

৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৬২

১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৫-১৫৬

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৪১

১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৪২

১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৪২

১৪. জয়া মিত্র, *হন্যমান,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ : জুন ২০১৬, ভূমিকা

১৫. পূর্বোক্ত

১৬. পূর্বোক্ত

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৯১

১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৬৮

১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৫-৩৬

২০. পূর্বোক্ত, ভূমিকা

২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১

২৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৪

২৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩০

২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩২

২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪১

২৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৪

২৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৬

২৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৪

৩০. মীনাক্ষী সেন, *জেলের ভেতর জেল,* কলকাতা, পিপলস্ বুক সোসাইটি, প্রথম পি.বি.এস.প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা. ২৭

৩১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা .৩০

৩২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৮৮

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮৭

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪১

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৬

৩৬. মীনাক্ষী সেন, *জেলের ভেতর জেল,* আমার কৈফিয়ত, কলকাতা, পিপলস্ বুক সোসাইটি, প্রথম পি.বি.এস.প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৩,

৩৭. মীনাক্ষী সেন, *জেলের ভেতর জেল,* কলকাতা, পিপলস বুক সোসাইটি, প্রথম পি.বি.এস.প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা. ১০

৩৮. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা. ১৫

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২১

৪০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২০

৪১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৩

৪২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৭

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২০

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৮

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৮৪

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৫

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১০

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৬৩

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৬৫

৫০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৭৪

৫১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮২

৫২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৬৬

৫৩. মলয়া ঘোষ, *লালবাজারে ৬৪ দিন,* কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১১, প্রস্তাবনা, পৃষ্ঠা. ২

৫৪. মলয়া ঘোষ, *লালবাজারে ৬৪ দিন,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৭

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩

৬০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫

৬১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫

৬২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৬

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৫-২৬

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৯

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩১

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩১-৩২

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৩

৬৮. পূর্বোক্ত, প্রচ্ছদ

৬৯. সন্তোষ রাণা, *রাজনীতির এক জীবন*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা. ১২৪

৭০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৯৯

৭১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৯৯

৭২. অজিত চক্রবর্তী, *জেলের গারদে জীবনের গান*, কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা. ৫৬

তৃতীয় অধ্যায়

জেলস্মৃতি : আন্দোলনের রূপরেখা

জেলস্মৃতি : আন্দোলনের রূপরেখা

১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সাল এই কালপর্বে যারা পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় জেলে গিয়েছিলেন তাদের জেল জীবনের প্রাক্ পর্বে, জেল জীবনকালে এবং জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যে রাজনৈতিক চিন্তা গড়ে উঠেছে তার গ্রন্থ ভিত্তিক আলোচনা বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্য। এই কালসীমায় লিখিত জেলজীবনের স্মৃতিকথা এক অর্থে তাঁদের আত্মজীবনীমূলক রচনা হয়ে উঠেছে। যেখানে তাঁদের রাজনৈতিক জীবনচর্চার একটি বিশেষ সময়ের মতাদর্শের কথা স্মৃতিকথাগুলিতে উঠে এসেছে। রাজনৈতিক চিন্তার দূরদর্শিতা যেমন অনেক জেলস্মৃতিগুলিতে পাওয়া যায়, তেমনই আবার অনেক গ্রন্থে রাজনৈতিক চিন্তার কোন ছাপ নেই। স্বভাবতই রাজনৈতিক উপাদান নির্ভর গ্রন্থগুলি আমাদের আলোচনার বিষয়। অনেক সময় গ্রন্থগুলিতে রাজনৈতিক চিন্তার বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করেছে। সুতরাং সাতের দশকের এক অস্থির কালপর্বে রাজনৈতিক বিভিন্ন ধারা উপধারা আদর্শ এবং প্রয়োগ হানতে হলে আলোচিত জেলস্মৃতিগুলির উপাদান মূল্য অনস্বীকার্য।

সাতের দশকে পশ্চিমবঙ্গে বহু শিক্ষিত, মননশীল নেতা ও কর্মী জেল বন্দি হয়েছিলেন তবুও জেলের অন্দরমহল সম্পর্কে তাদের লিখিত প্রতিবেদনের সংখ্যা খুব কম। নিম্নলিখিত জেলস্মৃতিগুলির নিরীখে আমি আমার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব। যথা- আজিজুল হকের *কারাগারে ১৮ বছর*, জয়া মিত্রের *হন্যমান*, মীনাক্ষী সেনের *জেলের ভেতর জেল*, মলয়া ঘোষের *লালবাজারে ৬৪ দিন*, অজিত চক্রবর্তীর *জেলের গারদে জীবনের গান*, সন্তোষ রানার *রাজনীতির একজীবন*। জেলস্মৃতির মধ্যে রাজনৈতিক ধারাটিকে বাদ দিলে যে ধারাটি অবশিষ্ট থাকে তা হল অরাজনৈতিক ধারা। এখানে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং জেলজীবনের সাধারণ উপাদান স্থান পেয়েছে। জেলস্মৃতিগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এমন কিছু আদর্শবাদী ব্যক্তিদের আত্মকাহিনি যাঁরা নকশাল আন্দোলনের সময়ে সমাজের নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে

নিজেদের মতাদর্শকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক যে সব মানুষ সেদিন চরিত্র ও কর্মগুণে ইতিহাসকে অলঙ্কৃত করেছেন এমন বহু জন ব্যক্তি এই গ্রন্থের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে আসন গ্রহণ করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সতীশচন্দ্র দে'র *নিঃসঙ্গ*গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন- "সে হিসাবে বইখানি ইতিহাসগন্ধি। এই আত্মকাহিনী সত্য বলেই এবং আত্মকাহিনীর সঙ্গে একের অতিরিক্ত বহুর যোগ আছে বলেই, একটি বিশেষ কালের বৃহৎ ও প্রবল প্রাণাবেগের সঙ্গে সে কাহিনী যুক্ত বলেই এতে ইতিহাসের অস্পষ্ট আভাস এসেছে। সেই কারণেই, এ কাহিনী একের কাহিনী হয়েও বহুর কাহিনী হয়ে উঠেছে।"[১]

নকশালবাড়ি আন্দোলন, আন্দোলনের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় একটি সংযোজন। যার পূর্ব ও পর আছে- রাজনৈতিক আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ, বামপন্থী আন্দোলন, সশস্ত্র লড়াই, ছাত্র সংগ্রাম, গ্রামের লড়াই, শহরের আন্দোলন ইত্যাদি। নকশালবাড়ি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে রাষ্ট্রের আক্রমণের একটা ধরন ছিল জেলখানায় বন্দি করে রাখা। শুধু বন্দি করে রাখা নয়, সেইসঙ্গে বন্দিদের উপর যত রকম অন্যায় অত্যাচার করা যায়, সব কিছু করত। বন্দিদের লেখায় একদিকে রাষ্ট্রের, ক্ষমতাসীন জেল কর্তৃপক্ষের, জেলকর্মচারীদের শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন, শাসন বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে মননে, ভাবনায় তাদের সঙ্গে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বন্দ্ব, বিরোধ প্রকাশ পেয়েছে। রাজনীতির পরিসরের বিস্তারে জেলখানায় এসে বিপ্লবী আদর্শকে, নতুন রাজনীতিকে পুনর্মূল্যায়ন করেছেন বন্দিরা। জেলের মধ্যে বন্দি-বাস্তবতার বিপরীতে, বিরুদ্ধতায় তাঁরা অন্য এক বাস্তবকে বানিয়েছেন। যা তাঁদের স্বপ্ন ও বিশ্বাসের মধ্যে গড়ে ওঠা যুক্তির বাস্তব। ফলে জেলখানায় থেকে নিজের অবস্থানকে অনুভব করে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, আদর্শ, উপাদান, ভাষা ইত্যাদি লেখার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। "প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য্য বলেছেন যে অভিজ্ঞতার যাপন ও যাপিত অভিজ্ঞতার ক্ষরণের মধ্যে তফাৎ হল এই রকম: যাপ্যমান অভিজ্ঞতা যেন টাটকা লেবুর সরবত, সময়ের মুহূর্ত নিয়ে তাৎক্ষণিক বোধ। আর যাপিত অভিজ্ঞতা হচ্ছে

লেবুর আচার, যার অণুতে অণুতে রোদের মতন অনেক সময় প্রবিষ্ট, তবেই তো আচার জারিয়ে ওঠে।"[২]

সাতের দশকে সারা ভারতের নানা প্রদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও অসংখ্য যুবক-যুবতীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রবিরোধী নকশালপন্থী আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে জেল বন্দি করা হয়েছিল। জেলের মধ্যে একদিকে নকশালবন্দিদের রাজনৈতিক অবস্থান, সংস্কৃতি এবং অন্যদিকে সাধারণ বন্দিদের জীবন, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদি কে তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে জেলবন্দি নকশালরা ছিলেন রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ; অন্যদিকে সাধারণ বন্দিদের বিশেষ কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক পরিচিতি না থাকলেও বন্দি জীবনের নানা মানবিক দিক ধরা পড়ে। নকশালবন্দিদের জেলনীতি ও কৌশল এবং রাজনৈতিক অবস্থানের বিশ্লেষণ স্মৃতিকথাগুলির মধ্যে লক্ষ করা যায়। জেলস্মৃতিগুলির মধ্যে দেখা যায় অনেকেই বন্দি হিসেবে রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে অমানবিক জেলব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। আবার অনেকের চিন্তায় সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সঙ্গে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ গুরুত্ব পেয়েছে। সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সমালোচনাও অনেকে করেছেন। সেই সমালোচনায় সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ প্রকাশ পেয়েছে। জেলস্মৃতিগুলির মধ্যে ছেলেদের লেখায় রাজনৈতিক দর্শন, তত্ত্ব, তাদের নিজেদের মতাদর্শ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। জেলের মধ্যে নকশালপন্থীরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে মতাদর্শের সাপেক্ষে নিজেদের মধ্যে তুলনা কথা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বেশি করে দেখা যায়। সেই তুলনায় মেয়েদের লেখা জেলস্মৃতিগুলিতে এই বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত কম লক্ষ করা যায়।

কারাগারে ১৮ বছর

ভারতের নকশাল আন্দোলনের প্রধান সংগঠক চারু মজুমদারের মৃত্যুর পরে আজিজুল হক ছিলেন দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান। তার লেখা গ্রন্থ *কারাগারে ১৮ বছর* নকশাল আন্দোলন তথা সাতের দশকের জেলজীবনের প্রামাণ্য দলিল। তিনি বইটি মূলত জেলখানায় বসেই লিখেছেন। সাতের দশকের জেলখানার চিত্র জেলবন্দি ছাড়া অন্য মানুষদের বোঝানো অসম্ভব। একদিকে অকথ্য দৈহিক নির্যাতন, অন্যদিকে তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে মানসিক নির্যাতন। আবার এর সঙ্গেই পাশাপাশি নিজেদের কমরেডদের খুন হয়ে যেতে দেখতে হয়। সেই দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়েই এগিয়েছে তাঁর *জেলখানায় ১৮ বছর*- এর প্রতিটা শব্দ, প্রতিটি পৃষ্ঠা। মূলত তিনি জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর নির্যাতনের প্রমাণ তুলে ধরেছেন গ্রন্থটির অভ্যন্তরে। আজিজুল হক পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলে বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে বন্দি হয়েছিলেন। তাঁর এই দীর্ঘমেয়াদি জেল অভিজ্ঞতার ফসল খন্ডে প্রকাশিত *কারাগারে ১৮ বছর* গ্রন্থটি। গ্রন্থটি 'আজকাল' পত্রিকায় ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে শারদ-সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লেখাটা পাঠকের কাছে পর্যালোচিত হয়েছে। গ্রন্থের মধ্যে আজিজুল হক তাঁর নিজের কথার সঙ্গে বলেছেন রাজনীতি, রাজনীতি তত্ত্ব, সংঘাত, রাজনীতির ইতিহাস, বিবিধ ঘটনা এবং নানান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ সমৃদ্ধ ঘটনা। তিনি 'আমার কৈফিয়ৎ' অংশে বলেছেন- "মানুষ অজেয়,অজেয় তার সহমর্মিতা, তার ভালোবাসা। তারই ইতিবৃত্তের নাম ইতিহাস। এই সহমর্মিতার নিদর্শন- এই লেখার প্রকাশ।"[৩] তাঁর এই সুদীর্ঘ জেলজীবনের বর্ণনায় জেলের মধ্যে নকশালবন্ধিদের প্রসঙ্গ ও তাদের রাজনৈতিক অবস্থান যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে সাধারণ বন্দিদের নানা প্রসঙ্গ।

আজিজুল হক বইটি লেখা শুরু করেছেন একটা মিটিং- এর উল্লেখের মধ্য দিয়ে। ১৯৬৪ সালের সপ্তম পার্টি কংগ্রেস শেষ হওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। জ্যোতি বসুকে নিয়ে মিটিং ডাকা হয় এবং আয়োজন করেছিল সিটি কলেজের ছাত্র ইউনিট। ছয়-সাতের দশকে এই ধরনের সভা-বৈঠক-আলোচনাচক্র অনেক হত। এটা থেকে বোঝা যায় যে এই সময়ে ছাত্র সমাজের

একটা বড় অংশ বেশ রাজনীতি সচেতন ছিল। তারা তাদের গভীর ভাবনা, মনোযোগ এবং আন্তরিকতা নিয়েই এইসব সভায় অংশগ্রহণ করত। শুধুমাত্র স্বার্থ, সুবিধা এবং সুযোগ গ্রহণ ছাড়াও মানুষের পাশে দাঁড়ানো এক গভীরতর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল। তাদের মধ্যে চিন্তা এবং সিদ্ধান্তের কিছু ভুল থাকতে পারে কিন্তু আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না। অখণ্ড সংস্করণে আজিজুল হক বলেছেন- "ব্যক্তি-মানুষগুলো অনেকে ক্লান্তিতে-শ্রান্তিতে সরে গেলেও একথা সত্য তাদের স্বপ্নগুলোতে কোন খাদ ছিল না, কোন স্বার্থ ছিল না, অন্ততপক্ষে আমি সেরকম মনে করি না।"[৪]

আজিজুল হকের স্মৃতিশক্তির প্রখরতা যে কত তীব্র ছিল তা মিটিং- এর বিবরণের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। সেই সময়ে স্বার্থের সংঘাত কীভাবে এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি আলগা করেছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের মধ্যে কোনো মতাদর্শগত পার্থক্য ছিল না। এইভাবে ধীরে ধীরে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে গেল এবং তার সঙ্গে শুরু হল গ্রেফতারি, আটক ও পুলিশি অত্যাচার। ছাত্রফ্রন্টে এই সময়ে 'মডারেট' বলে চিহ্নিত হয়েছেন বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং অনিল বিশ্বাস। অন্যদিকে আজিজুল হক, শৈবাল মিত্র 'আলট্রা' বলে চিহ্নিত হয়েছেন। তখন ছাত্র রাজনীতিকে নিজেদের সুবিধা মতো ব্যবহার করেছে 'মেনস্ট্রিম পলিটিক্সের' নেতারা- সেটা ডান বা বাম যে রাজনীতিই হোক না কেন। আজিজুল হকের বিশ্লেষণ থেকে উঠে এসেছে বাম কিংবা অতি-বাম, বিশেষত অতি-বাম মতবাদের বশবর্তীরা সম্পূর্ণ নির্ভর করেছেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যেসব দেশ বাম মার্গের পথিক, তাদের কার্যকলাপ, নীতি ও কর্মসূচীর উপর। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বা মধ্যবর্তী কোনো চিন্তাধারা একেবারেই গুরুত্ব পায়নি। গ্রন্থটির মধ্যে মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার সেই সময়কার একটি ছবি, সেই অস্থির সময়ের রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত, নানা ধরনের ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি একদিকে যেমন এসেছে, তেমন অন্যদিকে দায়বদ্ধতাও ফুটে উঠেছে।

আজিজুল হক দীর্ঘসময়ের জেলবন্দি একজন সক্রিয় বামপন্থী কর্মী ছিলেন। নকশাল আন্দোলনের কর্মী হয়ে তিনি সাতের দশকের জেলকে 'জেলবিদ্রোহের'[৫] যুগ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ছয়ের দশকের রাজনৈতিক বন্দিদের 'ভোগ সর্বস্বতা'র মধ্যে রাখাটাই ছিল তদানীন্তন সরকারি নীতি যাতে রাজনৈতিক বন্দিরা জেলের মধ্যে এমন এক সুবিধাভোগী শ্রেণিতে পরিণত হয় যে, পরবর্তীকালে বাইরে রাজনীতিতেও তারা কোনোভাবেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধচারণ করবে না। "এই কমরেডরা যদি দু বছর এই জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে যায়- এদের দিয়ে কি হবে? বুঝলাম এদের তৈরি করা হচ্ছে। আগামী দিনের শাসক হিসাবে এদের গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।"[৬] এরপর ১৯৬৯ সালে সি.পি.আই(এম-এল) প্রতিষ্ঠার পর থেকে নকশাল আন্দোলনে ধৃত রাজনৈতিক বন্দিদের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায়। রাজনৈতিক বন্দিরা হঠাৎ করে 'স্যার' থেকে 'শুয়োরের বাচ্চা'তে পরিণত হয়। "শুরু হল সত্যিকারের জেল খাটা। এর আগে পর্যন্ত যতবার জেলে গেছি- হলেও-হতে-পারি মন্ত্রী হয়ে! সি পি আই (এম-এল) হয়ে যাবার পর পুলিশ এবং প্রশাসন বুঝে ফেলল এরা অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে আর যাই হোক মন্ত্রী হচ্ছে না। সুতরাং তাদের আসল রূপে তারা হাজির হল। 'স্যার' থেকে 'শুয়োরের বাচ্চা' হয়ে গেলাম।"[৭] রাজনৈতিক বন্দিদের "যে সব সাধারণ বন্দিরা সেবা-পরিচর্যা করতেন তাঁরা জেলের ভাষায় 'ফালতু'। মানুষ হয়েও 'ফালতু'। এদের সম্পর্কে রাজনৈতিক জেলবন্দিদের কোন রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা বা অবস্থান ছিল না। রাজনৈতিক বন্দিরা মনে করতেন সাধারণ বন্দিদের লড়াইটা সাধারণ বন্দিদেরই করতে হবে- এদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্ন নেই।"[৮]

ছয়ের দশকে প্রথমবার জেলে এসে আজিজুল পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজনৈতিক বন্দীদের পাশাপাশি সাধারণ বন্দিদের অবস্থানগত যে পার্থক্য দেখেছিলেন তা তাঁর যুবক মনে সেই সময়ের রাজনৈতিক বন্দীদের বিষয়ে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। ছয়ের দশকে রাজনৈতিক

বন্দীদের চোখে সাধারণ বন্দিরা ছিলেন 'লুম্পেন'। যুবক আজিজুল এ সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন- "যদি কিছু করি তো এই 'লুম্পেনগুলো'র জন্যই করব। জেলের জামাইদের জন্য বলার অনেক লোক আছে।"[৯] এই ধরনের মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে ছিল ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়কাল যখন একদিকে রাজনৈতিক বন্দিদের "পঞ্চব্যঞ্জন নয়, পাঁচ দুগুণে দশটা ব্যঞ্জনে লাঞ্চ সারা হল। ... পাশেই সাধারণ বন্দিদের খাবার। ... তাঁরা তরকারিতে এক টুকরো আলুর জন্য মারামারি করছেন, তলার ডালটা কে নেবে তার জন্য প্রথমে কেউ থালা পেতে ভাত নিচ্ছেন না।"[১০] স্বাভাবিকভাবেই আজিজুলের দেখা রাজনৈতিক বন্দিরা ছিলেন 'জেলের জামাই'।

আজিজুলের লেখায় ছত্রে ছত্রে বিবৃত হয়েছে অন্তর্দলীয় সংঘাতের ইতিহাস। এহেন পরিস্থিতিতে কোনো নীতি ও আদর্শের প্রতি অনুগত হয়ে থাকা বেশ কঠিন ব্যাপার। প্রত্যেক ঘটনার পিছনে অদৃশ্য অথচ বর্তমান, রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকা এবং প্রেক্ষাপটের মত সমকালীন ইতিহাস বারবার স্পষ্ট হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলীকে সামনে নিয়ে আসায় ঘটনাক্রমের পারম্পর্য নষ্ট হয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। আজিজুল হকের লেখা পড়লে সাধারণ বুদ্ধিমান, নীতিপরায়ণ মানুষের মনে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে ভীতি ও সংশয় জেগে উঠতে বাধ্য। এত অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্বার্থসর্বস্বতা এবং স্বার্থরক্ষার তাগিদে মানবিকতা, মূল্যবোধ সবকিছুকে অনায়াসে বিসর্জন দেওয়ার পরিস্থিতিতে তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি নিজেই পার্টিকে 'সাফোকেটিং ফেজ' বলে উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক বন্দিদের যা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হতো তা 'আগামী দিনের শাসক হিসেবে গড়ে তোলা'-র প্রতিষ্ঠান বলে জেলকে মনে করেছেন, যা কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই (এম)- এর মিলিত চক্রান্ত বলে চিহ্নিত করেছেন।

জেলের মধ্যে বন্দি অবস্থায় থাকা কমরেডরা যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যাচ্ছেন তখন তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার্কিক আলোচনা হত। যেমন- জেলভাঙ্গা বা জেল পালানো,

জামিন নেওয়া ইত্যাদি। চারু মজুমদার জামিন নেওয়া সম্পর্কে বলেছেন- "শ্রমিক-কৃষক জামিনই নিক আর বন্ডই দিক, তবু তারা বিপ্লবী কারণ তাদের জীবনের লড়াই ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই।"[১১] কৃষকরা মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একদিনও থাকতে পারেন না- এটাই কৃষককে বিপ্লবের দিকে ধাবিত করে। আবার এরই জন্য অনেক সময় তাঁরা বিপ্লব-বিরোধী হয়ে যান সুতরাং জামিনের সুযোগ থাকলে কৃষক জামিন নেবেন না- এটা হয় না। কিন্তু যারা মধ্যবিত্ত ক্যাডার অর্থাৎ যারা গ্রাম থেকে কৃষকের সঙ্গে ধরা পড়েছে, তাদের জামিনের বিরোধী ছিলেন আজিজুল এবং আরো অনেকে। সেই সময় বাইরে সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য জেলের ভেতরে সংগ্রাম গড়ে তোলার কর্মসূচি সিদ্ধান্ত হয়েছিল। যার অনিবার্য ফল ছিল জেলদখল। সুতরাং "সামাজিক পরিবর্তনকামী যে কোনো পার্টির কাছে 'জেল-পালানো' ব্যাপারটা সংগ্রামের একটা অংশ।"[১২] সেই সময় জেল থেকে বিপ্লবী কায়দায় বেরিয়ে আসার কোন লাইন ছিল না। তাছাড়া তখন উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির নামে একটা সার্কুলারে বলা হল "এই সময়ে কমরেডদের কোনোক্রমেই বাইরে বেরিয়ে আসা উচিত নয়...।"[১৩] এই সময় আজিজুল হকের মনে হয়েছিল "জেলকে সত্যি সত্যিই বিপ্লবী তত্ত্ব এবং প্রয়োগের বিশ্ববিদ্যালয় করা যায়।"[১৪] জেলের মধ্যে 'ডিভিশন' ও 'নন-ডিভিশন'- এর প্রস্তাব নিয়েও নানা মতপার্থক্য ঘটেছে। কমরেডদের একাংশ ডিভিশন বিরোধী ছিলেন। তাই একদল প্রস্তাব দিয়েছিল- "'সকলে মিলে একসঙ্গে থাকলে কেমন হয়?' 'ডিভিশন' ও 'নন ডিভিশন' সকলে মিলে একসঙ্গে থেকে, নিজেদের খাবার সকলে মিলে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খাব। নিজেরাই রান্না করে নেব।"[১৫] তখন "নব-কংগ্রেসি এবং যুব-কংগ্রেসিরা জেলাগুলোতে এজেন্ট ফিট করে ছেলেদের রিক্রুট করতে শুরু করেছে।"[১৬] ফলে বিষয়টা কমরেডদের ভাবিয়ে তুলেছিল। কারণ যারা গ্রেফতার হয়ে আসছে তাদের মধ্যে আশি ভাগ কিশোর এবং বাকিরা যুবক। অভ্যুত্থানের যুগে এরা দলে দলে নানা কারণে পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। বেশিরভাগ মানুষ পার্টির নামও বলতে পারে না।

তেনালিতে পার্টি কংগ্রেস প্রস্তুতিতে কনভেনশনে বসলেন নেতারা এবং সভা থেকে স্তালিন ও মাও- এর ছবি অন্তর্ধান হয়ে যায়, যা নিয়ে দলিল বের হয় সেই সময়ে। তখন নেতারা বলত- "তেনালির ছেনালি"।[১৭] তেনালির পর জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণবাবু ও প্রমোদবাবুর লাইনে যোগ দেন। চিন আক্রমনের পরও কংগ্রেস এবং নেহেরু-ইন্দিরা সম্পর্কে এই একই ধরনের মোহের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। এর ফলে অসংখ্য গ্রুপ সৃষ্টি হল, এদের বলা হত 'আল্ট্রা'। আজিজুল হক এবং অন্যান্যরা তাদের বলত 'অফিসিয়াল' বা সরকারি। এই সময় কলকাতায় সপ্তম কংগ্রেসের প্রস্তুতি চলেছিল। এই অবস্থায় কেন্দ্রের সরকার দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল। তখন রাজ্যে জারি হল অঘোষিত জরুরি অবস্থা। প্রথমে শীর্ষস্থানীয় নেতারা ধরা পড়েছিলেন শুধু জ্যোতি বসু ছাড়া। তারপর নানান টালমাটাল এর মধ্যে সপ্তম কংগ্রেস শেষ হতেই দ্বিতীয় সারির নেতারা গ্রেফতার হয়েছিল। এই সময় শাখা সম্মেলন, জেলা সম্মেলনে বিরোধীদের নাম জেনে গিয়েছিল পুলিশ।

রাজনৈতিক বন্দিরা বিশেষত নকশাল বন্দিরা তাদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং আলাপচারিতার জন্য জেলের মধ্যে একই ওয়ার্ডে দলগতভাবে থাকাটাই পছন্দ করতেন। সেই সময় জেল-পার্টি গড়ে উঠত মূলত ফাইল কমরেডদের নিয়ে। সাধারণ বন্দিদের প্রসঙ্গে পার্টির জেল লাইন নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি জেলের নিজস্ব পরিস্থিতি ও অবস্থা সাপেক্ষে সাতের দশকে নকশাল বন্দিদের সাথে সাধারণ বন্দিদের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সাতের দশকের প্রথম দিকে নকশাল বন্দিদের দুটো নীতি ছিল। যথা- বদলা নেওয়া এবং জেল পালানো। এর মধ্যে প্রথমটা কারও কারও মাথায় কাজ করলেও তা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়টা পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্যকরী করা হয়েছিল। চারু বাবুর রাজনৈতিক লাইন ছিল 'গেরিলা যুদ্ধ'। যেখানে সাধারন মানুষদের প্রত্যক্ষ ভাবে জড়ানো হত না। চারু মজুমদারের মতে- "জেলকে ধরা হবে একটা গ্রাম হিসাবে এবং তার মধ্যে বিপ্লবী স্কোয়ার্ড অত্যাচারী জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বদলা

নেবে অথবা জেল ভাঙ্গার পরিকল্পনা করবে। উভয় ক্ষেত্রেই এই ধরনের বন্দিদের সঙ্গী করার তেমন সুযোগ ছিল না।"[১৮]

পরিণত রাজনৈতিক বুদ্ধি আর রাজনৈতিক চেতনা বাড়ানোর জন্য সাতের দশকে নকশাল বন্দিদের মধ্যে প্রধান সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলে নকশাল বন্দিদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে রাজনৈতিক শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করতেন। যেমন- "সন্ধ্যার পর প্রত্যেকটা গ্রুপেই রাজনৈতিক আলোচনা করবেন। ১. পার্টির ইতিহাস এবং কর্মসূচি, ২. মৌলিক রচনাবলী, ৩. কৃষক সমস্যা- মূলত এই তিনটেই হবে গ্রুপ আলোচনার বিষয়বস্তু। সপ্তাহান্তে গ্রুপ লিডারদের বৈঠক। সেখানে লিখিত ভাবে রিপোর্ট রাখতে হবে। মাঝে মাঝে অর্থাৎ মাসান্তে একটা করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নিজেরাই গান, নাটক, কবিতা লিখে অনুষ্ঠান করা।"[১৯]

সাতের দশকে পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ জেলেই কর্তৃপক্ষের নারকীয় অত্যাচার আর হত্যার ধারাবাহিক সংস্কৃতির বিপরীতে গড়ে উঠেছিল নকশাল বন্দিদের প্রতিরোধের সংস্কৃতি কিন্তু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দুটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল এক বেশিরভাগ নকশাল বন্দি সাতের দশকে ছিল কিশোর অথবা সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত যুবক-যুবতী তাই এদের মধ্যে কোন পরিণত রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা ছিল না আর দুই নকশাল বন্দিরা প্রথম দিকে সাধারণ বন্দীদের তেমন কাছে আসতে পারেনি তাই আজিজুল হক লিখেছেন- "যারা গ্রেফতার হয়ে আসছে তাদের মধ্যে শতকরা আশিজনই কিশোর, বাকিরা যুবক। এরা মরতে জানে, মারতে জানে, কিন্তু কেন মরবে, কেনই-বা মারবে- এসব প্রশ্নের উত্তর জানে না। একটা সার্ভে করে আশ্চর্য হয়ে গেলাম শতকরা সত্তরজনই জানে না, 'পার্টির নাম কি?'... যে প্রচন্ড মেজাজ নিয়ে একজন জেলে ঢুকেছে জেলে ঢুকেই সে মেজাজ ঠান্ডা হয়ে যায় না। সেই মেজাজের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে। কংগ্রেসী-পেটাই, মাকু-পেটাই, চামড়া-পেটাই চলছে।"[২০]

যে সমস্ত ছেলেরা বাইরে নকশাল অর্থাৎ মারদাঙ্গা করে জেলের ভেতর এসেছিল তাদের বেশিরভাগ অংশ জেল থেকে বেরোবার জন্য ছটফট করত সেই সমস্ত ছেলেদের একটা বড় অংশ নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লাইন করতে শুরু করল পরে কংগ্রেসি সুব্রত মুখার্জি তত্ত্বাবধানে তারা একটা আলাদা ফাইল খুলে বসল- "রাজনীতি বিহীন-জঙ্গিপনার করুণ পরিণতি দেখেছিলাম সেদিন। ঘটনা ঘটিয়ে নিজেদের ফায়দা উঠানো যায় এটা হয়ত সত্য কিন্তু অরাজনৈতিক ঘটনা- অংশগ্রহণকারীদের পাঁকেই ঠেলে দেয়। ইতিহাসের গতি মাঝপথে সাময়িকভাবে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। কোনো সারথির পক্ষেই তখন আর সম্ভব নয় সেই রথকে রাস্তা সারিয়ে ওই গর্ত-খোঁড়া রাস্তা দিয়ে নিয়ে যান। সময়ের অপেক্ষায় এই রথকে হোঁচট খেতে খেতেই এগোতে হবে। অন্য কোনো পথ নেই। এটা নির্মম সত্য।"[২১] অনেক বিপ্লবীর স্মৃতিধন্য প্রেসিডেন্সি জেলের কুখ্যাত বা বিখ্যাত ৪৪ ডিগ্রি সেল। "যুগে যুগে অনেক দেশপ্রেমিকের কান্না-রক্ত-দৃঢ়তার সাক্ষী এখানকার প্রতিটি ইট-কাঠ-পাথর।"[২২] এখানেই কাটিয়েছেন বারীন ঘোষ, সত্যেন, কানাই প্রমুখেরা। অনুশীলন সমিতির নেতা শ্রী ত্রৈলক্য মহারাজ এই কুখ্যাত ৪৪ ডিগ্রি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন- "শ্রীঅরবিন্দ এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রি কিছুদিন থাকিবার পর শ্রী ভগবানের দর্শন লাভ করিলেন এবং জেল হইতে মুক্ত হইয়া পরে পন্ডিচেরীতে আশ্রয় লাভ করিয়া আধ্যাত্মশক্তির উৎস সন্ধানে ধ্যানমগ্ন হইলেন, ৪৪ ডিগ্রির যে-রূপ ব্যবস্থা ছিল তাতে বন্দীরা চোখে সরষেফুল দেখিত। একবার মুক্তিলাভ করিলে আর বড় কেহ জেলের নাম করিত না- বিপ্লবের পথই পরিত্যাগ করিত।"[২৩] স্বাভাবিক অবস্থায় 'জেলকা গরমি তিন রোজ!' অর্থাৎ জেলের আপৎকালীন অবস্থা বলে তিন দিন। তবে অনেক সময় একদিনেই ভেঙ্গে যায় আবার তিন মাসও চলতে পারে। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষ সকলকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল। রাজনৈতিক সংগঠকরা হয় সেলে না হয় অন্য জেলে স্থানান্তরিত হল। পরে পার্টি গড়ার মুখেই এই ঘটনা সব ভেঙ্গে দিল। আবার নতুন করে পার্টি গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আজিজুল হক বলেছেন- "৬৯ থেকে ৭১-এর প্রথম দু-

তিন মাসকে যদি বলা যায় কৃষক এবং ছাত্র-যুবকদের বিদ্রোহের যুগ, তাহলে গোটা '৭১-কেই বলতে হবে জেল বিদ্রোহের যুগ। চারু মজুমদারের ভাষায়- 'দুশো বছরের সাম্রাজ্যবাদ তার শাসনযন্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী ইমারত হিসেবে গড়ে তুলেছিল এই জেলখানা...' সেই জেল আজ বিদ্রোহের কেন্দ্র। 'বিপ্লবীদের সামনে সেই ইমারত' তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ছে। 'বন্দি হত্যা এবং নৃশংস দমন পীড়ন সত্ত্বেও এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকার জেল পালানো, জেল-বিদ্রোহ দমন করতে পারছে না, পারবে না।"[২৪]

জেল-পার্টি কমিটি মূলত গড়ে উঠেছিল ফাইলের কমরেডদের নিয়ে। কিন্তু ব্যাপক সমালোচনার চাপে কিছুদিনের মধ্যেই তা ভেঙে গেল। এজন্য রাজনৈতিক কাজের মাধ্যমে কুরিয়ার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা এবং প্ল্যান ও অ্যাকশন সম্পর্কে প্রত্যেককে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করা হয়। তখন ৪৫ জনের কাছ থেকে প্ল্যান আহবান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর সম্পূর্ণ আমাদের ভেতরের উদ্যোগেই হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়েই এই পরিকল্পনা করার কথা ভাবা হয়েছিল। এছাড়া প্রত্যেকেই ডাম্পিং প্লেস খুঁজে বের করতে উৎসাহ দিতে হবে। সবচেয়ে বড় হল- প্রত্যেককে এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ- "নিজের মৃত্যুর বিনিময়ে কমরেডদের মুক্তি আমার নিজস্ব মুক্তিটা গৌণ।"[২৫]

১৯৭৫ সালে দেশের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এল- দমবন্ধ করা ইমার্জেন্সি। তাদের ভারে (নামে) এবং ধারে (টাকায়) জেল হয়ে গেল খোলামেলা। নকশাল বন্দিদের উপর নিষেধাজ্ঞা নিষেধ থাকলেও সেটা চালু করার কোনো ফোর্স থাকল না। ফলে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা, যৌথ প্রেস এবং যৌথ প্রচার (গোপন)- এর ব্যবস্থা করা হল। এই সময় জ্যোতি বসু মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে সিটুর সম্মেলনে বলেন- "আই এন টি ইউ সি-র অনুমতি ছাড়া কোথাও কোনো আন্দোলন হবে না।"[২৬] কিছুদিন পর পার্টি কমিটির সার্কুলার বেরোয়-

"বিপ্লবী যুদ্ধের মূল রণকৌশলগত নীতিই হল শত্রুবাহিনীর মুভমেন্ট আমরা নিয়ন্ত্রণ করব। আমরা যেমনটা চাই ওরা সেই রকম ভাবে চলাফেরা করবে। এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারাবেন না।"[২৭] রাজনীতিগত ভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে মতাদর্শগত দৃঢ় কর্মীরা যদি কিছু করব ভাবে তাহলে তাদের কে আটকাবে? আন্দোলনের কুশীলবরা এখনো বেঁচে আছেন এবং সরকার আজও প্রতিবাদী লোকদের নিকেশ করে দেবার রাজনীতিতেই বিশ্বাসী।

সাতের দশকে নকশালবন্দিদের উপর বদলা নেওয়ার নীতির সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশ কিছু নির্দেশ ছিল। যেমন, জেল বন্ড না দেওয়া, ফটো তুলতে না দেওয়া, হাতের লেখা না দেওয়া। এছাড়াও রাজনৈতিক বন্দিরা বিশেষত নকশালবন্দিরা তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং আলাপচারিতার জন্য জেলের মধ্যে একই ওয়ার্ডে দলবদ্ধভাবে থাকাটাই পছন্দ করতেন। সেই সময় জেল-পার্টি গড়ে উঠত মূলত ফাইলের কমরেডদের নিয়ে। সাতের দশকে পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জেলে নকশালবন্দি / বন্দিনীদের সঙ্গে সাধারণবন্দি / বন্দিনীর সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ক্ষেত্র বিশেষে নকশালবন্দি রা সাধারণ বন্দিদের সাথে মেলবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। যদিও পার্টি থেকে সাধারণ বন্দিদের সাথে নকশালবন্দিদের সম্পর্কের বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক নির্দেশ ছিল না। ফলে ৭০-এর প্রথম দিকে সাধারণ বন্দিদের সঙ্গে নকশালবন্দিদের বিচ্ছিন্নতা ছিল। নকশালবন্দিদের এই দুর্বলতাকে স্বীকার করে আজিজুল হক লিখেছেন— "বন্দিরা বুঝুন আমরা কে? কী চাই, কেন চাই? এগুলো না বোঝার জন্যই সাতের দশকে এই দমদমেই বন্দিদের ভালো একটা অংশ খুনে বাহিনীর সদস্য হয়ে গিয়েছিল।"[২৮]

সাতের দশকে জেল অত্যাচারের আর এক প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী হিসেবে আজিজুল হক লিখেছেন— "নকশাল মারতে হবে শুনলে পোষা গুণ্ডাবাহিনীগুলোর চোখে-মুখে যে 'কিলার ইনস্টিংক্ট' ফুটে উঠত, সাতের দশকের সে-সব-মুখ যারা না দেখেছে তাদের বোঝানো যাবে না।

খোলা তলোয়ার, লাঠি, রড, বেয়োনেট লাগানো মাস্কেট নিয়ে হুড়মুড় করে খুনিবাহিনী ঢুকছে। উল্লাসে তারা চিৎকার করছে— 'জয় বজরংবলী কী জয়।' এদিকে চিৎকার— 'রক্ত দিয়ে, রক্ত নিয়ে, নয়া ভারত গড়ছি গড়ব।"[২৯]

কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কৌশলগত কারণেও সাধারণ বন্দি, জেল সেপাই এবং নকশালবন্দিদের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল। যেমন, ১৯৭৬ সালে প্রেসিডেন্সি জেল ভাঙার সময় নকশালবন্দিরা কৌশল হিসেবে সাধারণ বন্দি ও জেল সেপাইদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। বলা হয়েছিল— "প্রত্যেক বন্দি কে কাজে লাগান। তাদের পরামর্শ ও উপদেশ নিন। তবে সাবধানে, সে যেন বুঝতেও না পারে কী কাজে তাকে লাগানো হচ্ছে।"[৩০]জেল-বিবর্তনের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে জেলকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে। প্রথম দিকে বলা হত 'প্রতিশোধাগার', তারপর হল 'কারাগার', এখন আবার 'সংশোধনাগার'। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, জেল আছে জেলখানাতেই।

জেলের চারদিকে বিশ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে পৃথিবীর গতি স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে ভয়াবহ গুমোট আবহাওয়া, চাপা কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙে জেলবন্দিদের। এদের সমাজ-সংসার ত্যাগ করেছে। তাই পারিবারিক আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তা গ্রাস করে বেশিরভাগ সাধারণ বন্দির মনোজগৎ। ফাঁসির আসামীও তাই নির্জন সেলের দেওয়ালে লেখে—

"আট বছর অপেক্ষায় আছি
কবে হবে ফাঁসি?
তের বছরের মেয়েটা আমার
মরে গেছে খবর পেলাম।
চিকিৎসার অভাবে।

বেঁচে কি হবে?

দাও, দাও। আমি খুনি

এখনি দাও ফাঁসি।”[৩১]

কাঁচা হাতে সেলের দেওয়ালে লেখা এ কবিতার সাহিত্যিক মূল্য থাকুক বা না থাকুক এর মধ্যে ফুটে উঠেছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে থাকা এক সাধারণ বন্দির পারিবারিক ভাবনা আর মনের হা-হুতাশ। এ ধরণের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর পারিবারিক চিন্তার একটা গভীর বেদনাবোধ সব সময়ই জেলের হাওয়াকে ভারী করে রাখে।

হন্যমান

হন্যমান-এর প্রথম পর্যায়ে লেখিকা বিবরণ দিয়েছেন মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের হাসপাতালের। প্রচণ্ড স্লোগানের শব্দে সকালের আকাশ থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে জেলের গারদ। তাঁর জীবনে শুরু হয়ে যায় জেল-জীবন পর্ব। জেলের ভেতর থাকাকালীন বাইরে আন্দোলনের খবর চিঠির মাধ্যমে ছেলেদের ওয়ার্ড থেকে পাওয়া যেত। ছেলেদের ওয়ার্ড থেকে আলাদা পথে খবর আসত অন্যান্য কমরেডদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। আবার অন্যদিকে ছেলেদের ওয়ার্ড থেকে আসতো বেডকভার, পেঁয়াজ ইত্যাদি। বাইরের রাজনৈতিক পারদ ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জেলের দরজা ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যেত, কারণ বাইরের আন্দোলনের গতিপথের কোনো খবর জেলের মধ্যে না এসে পড়ে। যারা সরাসরি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন তারাই শুধু জেলের অভ্যন্তরে এসেছেন এমন নয়। এমন অনেক বন্দি আছেন যাঁদের আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। গঙ্গা বেরা নামে একটি মেয়ে গ্রামের রাজনৈতিক পার্টির কর্মীকে নিজের ঘরে থাকার থাকতে দিয়েছিলেন। এর পরে তাঁর স্থায়ী বাসস্থান হিসাবে ঠাঁই হয়েছে জেলের অভ্যন্তরে।

ধীরে ধীরে আন্দোলনের ব্যাপকতা নিভে যাচ্ছে। প্রতিদিনই আশপাশ থেকে গ্রেপ্তার হয়ে যাচ্ছে কমরেডরা। ফলে দিন দিন আন্দোলনের জাল ছোট হয়ে আসছে। নকশাল বন্দিরা লক-আপ- এর পর স্লোগান দিয়ে শেষে গান গাইত। এর পাশাপাশি মেট্রনের নিরুৎসাহে মেটরা কংগ্রেস পার্টির নামে, দিল্লির নেত্রীর নামে স্লোগান দিত। কমরেডরা জেনে বুঝে জেলের অত্যাচার, মৃত্যু সহ্য করেছিল। রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের পর থেকে নকশাল আন্দোলন পর্যন্ত একইভাবে জেল চলেছে নিজস্ব ছন্দে, নিজস্ব মহিমায়। জয়া মিত্র নকশাল আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন- "একবারও মনে হয় না জীবনের যে দশ-বারো বছর নকশাল আন্দোলন করেছি তাতে কোনও ভুল ছিল। বরং ওটাই জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় ছিল।দেশের নদীনালা মানুষকে চেনার যে কথা বলি তার শুরু নকশাল আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই। না হলে জানতে পারতাম না রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির কি সম্পর্ক। নিজে মরতে মরতেও যে পাশের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায়... এ শিক্ষার শুরুও সেখান থেকেই। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি যে, মেয়েরা সেদিন নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে নানা অসাম্য ও অত্যাচার সহ্য করতে হলেও আজ সেই করুণ কাহিনি শুনিয়ে সস্তা সহমর্মিতা আদায় করতে চাই না। এটা হয়ে থাক আমাদের বীরত্বের গল্প।"[৩২]

জেলের ভেতর জেল

একবিংশ শতাব্দী প্রথম দশকে ত্রিপুরার ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান নাম মীনাক্ষী সেন। সাতের দশকে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে প্রেসিডেন্সি জেলে দীর্ঘ কারাবাসকালে মীনাক্ষী সেন যে মমতা দিয়ে সামাজিক অন্যায় ও অমানবিকতার শিকার হওয়া মেয়েদের দেখেছেন, সেই মমতার অভিজ্ঞান-স্বরূপ রচিত হয় *জেলের ভেতর জেল* গ্রন্থটি। ফলে সেই সময়ে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল পাগলবাড়ি পর্ব। তিনি অনেক কঠিন বিপদ পার করে, নির্মম পুলিশি অত্যাচার সহ্য করে, মৃত্যুর গা ঘেঁষে বেরিয়ে এসেছিলেন। রাজনৈতিক কর্মী হয়েও তাঁর লেখায় রাজনীতি

তেমনভাবে স্থান পায়নি, কারণ একজন রাজনৈতিক চেতন-মনস্ক মানুষ নির্যাতন, নিষ্ঠুর পীড়নের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই আন্দোলনের দিকে ধাবিত হন। রাষ্ট্রশক্তির কাছে সেই সময় চূড়ান্ত বামপন্থা একটি মারাত্মক অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত ছিল। তাই যারা কোনো অপরাধ না-করেই রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়নকে সহ্য করতে হয়েছিল, তাদের কথা তাঁকে বেশি ভাবিয়েছে। আমার কৈফিয়ৎ অংশে তিনি বলেন- "অকারণ-অভাবিত পীড়নের কবলে পড়া, নিঃসহায় স্তম্ভিত সেই তাদের ঘিরেই, জেলের ভেতরেও যখন জেল রচিত হ'তে দেখা যায়- তখন আর কোন প্রসঙ্গ দিয়েই বা আরম্ভ করা যায় জেলজীবনের প্রথম পর্ব।"[৩৩]

১৯৮০ সাল থেকে সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'স্পন্দন' সাহিত্যপত্রের নানা নামে লেখাগুলি প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত। ১৯৯৩ সালে 'স্পন্দন' প্রকাশনী থেকে পূর্ণাঙ্গ বই আকারে বের হয়- জেলের ভেতর জেল (পাগলবাড়ি পর্ব)।

জেলের ভেতর জেল (পাগলবাড়ি পর্ব) গ্রন্থটি মীনাক্ষী সেনের নিজস্ব অভিজ্ঞতাজাত যন্ত্রণার ফসল। সমগ্র লেখা জুড়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমির ইতিহাস বর্ণিত হয়নি। তিনি জেলজীবনে দেখেছেন নিরপরাধ কিন্তু বিচারাধীন বন্দিনী কিংবা বিচারের ভুলে দোষ না করে শাস্তি পাওয়া বন্দিরা শুধু অপরাধী নয়, যারা আইন-আদালত, সমাজ-সরকার কারও কাছেই অপরাধী নয়- তারাও অপরাধীর মতো জেলবাস করতে। তিনি তাঁর ভেতরের যন্ত্রণা মুক্তির উপায় হিসেবে জেল অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। নকশালবন্দিরা সবসময় সাধারণ বন্দিদের কথা চিন্তা করত; তাদের হয়ে জেলে প্রতিবাদ করা ছিল অন্যতম কাজ। সাতের দশকে প্রেসিডেন্সি জেলে সাধারণ বন্দিদের বিরুদ্ধে জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদে নকশাল বন্দিরা "লক-আপ বয়কট"[৩৪] করেছিলেন। জেলের মধ্যে নকশাল বন্দিদের নিয়ে নানারকম চর্চা হত 'জেল হাসপাতালে' (মেট্রনের ঘরে)। মেট্রন ও মেটরা (সাজাপ্রাপ্ত বন্দি)

নকশাল বন্দিদের নিয়ে যেগুলো বলত, সেগুলো হল- "আমরা সাংঘাতিক হিংস্র, সুযোগ পেলেই মারামারি করি, কারো কথা শুনিনা। কাউকে মানিনা। এমন কি যে 'মেট্রন মা', তাকেও কেয়ার ক'রে চলি না... এইসব... কতো কথা।"[৩৫] কোর্টে যাওয়ার পথে ছেলেদের সঙ্গে দেখা হলে গোপনে চিঠি মাধ্যমে তাঁরা মাঝে মাঝে আন্দোলনের খবর পেতেন।

লালবাজারের ৬৪ দিন

মলয়া ঘোষের *লালবাজারের ৬৪ দিন* বাহান্ন পৃষ্ঠার একটি ছোট্ট বই। প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ার সময় আমরা প্রত্যেকেই মলয়া ঘোষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তাঁর শৈশবকাল ছিল প্রায় সমসাময়িক। সেইসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল দেশের রাজনৈতিক আকাশে। তাই জীবন থেকে দ্রুত শৈশব চলে যাচ্ছে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি তখন প্রতিটি পরিবারের সুষ্ঠু সামাজিক জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করেছিল।তখন থেকেই মলয়া একটু একটু করে রাজনৈতিক জীবনের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। দেশভাগের আগে 'দেশ' কথাটার একটা বিশেষ তাৎপর্য তিনি মনে মনে পোষণ করতেন। এরপর বাংলায় ১৯৪৩ সালের সেই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ- না খেতে পেয়ে বাংলার মানুষের মরার দিন। আর কিছুদিন পরেই ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এল। তখন পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। ইতিহাসের এই দুঃসময়, দেশের দুর্যোগ তাঁর জীবনে সবসময় তাড়া করে বেরিয়েছে। মলয়া ঘোষের পরিবারে জাতীয় কংগ্রেসের গভীর প্রভাব ছিল। বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে তাদের বসবাস ছিল। আর ওই গ্রামেই ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাড়ি। চল্লিশের গোড়ার দিকে প্রফুল্ল রায়ের বাড়িতে 'বন্দেমাতরম্' গান শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান এবং তখন থেকেই দেশের প্রতি অদ্ভুত একটা টান তৈরি হয়ে যায়, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসার জন্ম নেয়।

১৯৬০ সাল থেকে মলয় ঘোষের শিক্ষকের জীবন শুরু। সত্তর দশকের শুরুতেই যে রাজনৈতিক মতবাদের ঢেউ পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে বয়ে যায় তা মলয়াকে প্রভাবিত করেছে। বিয়ের পর একটা সময়ে তিনি মনে করেন যে তাঁর প্রথম জীবনের সব বিষাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করবেন। আর তখন মনে হয় তার জীবনকে অর্থপূর্ণ করবে রাজনৈতিক জীবন। তাঁর স্বামী গৌতম ঘোষ রাজনৈতিক কারণে আত্মগোপন করেছিলেন সাতের দশকে। অবশ্য মলয়ার রাজনৈতিক জীবনদর্শনের সূচনা হয়েছিল ছ'য়ের দশকে। ষাটের দশকে তিনি শিক্ষক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং প্রতিটি আন্দোলনের কর্মসূচীতে তিনি যোগ দিয়েছেন। মলয়া তাঁর রাজনীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন- "রাজনীতি তো শুধু নির্বাচন সর্বস্ব ব্যাপার নয়। এটা একটা জীবনদর্শন। জীবন জগৎকে আমি কীভাবে দেখি"[৩৬] সুতরাং তাঁর রাজনৈতিক জীবনদর্শনের প্রকৃত সূচনা শিক্ষক জীবনেই ঘটেছিল। মেটিয়াবুরুজের মুদিয়ালি রোড সংলগ্ন বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করেছেন এবং সেই অঞ্চলের শিক্ষক সংগঠনের(A.B.T.A) সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এইসময় পারিবারিক বন্ধুর পরামর্শে বস্তিতে দরিদ্র পরিবারের মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যাপারগুলো নিয়ে দেখাশোনা করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করতে থাকেন।

সাতের দশকে উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং জেলায় 'নকশালবাড়ি'-র কৃষক বিদ্রোহের ফলে কলকাতা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই আন্দোলনের রেশ তখন মলয়ার মনেও পড়েছিল।কারণ যেকোনো সচেতন নাগরিকের উপর তার রেশ পড়তে বাধ্য। দেশের কথা ভাববার মৌলিক অধিকার সকলের আছে। তাই সাতের দশকে কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গে মানুষের আন্দোলনে ভয়ার্ত হয়ে পড়েছিল। সরকারের ঘরে খুঁটিগুলি ঘুণ ধরে আলগা হয়ে যেতে থাকে। ফলে সরকার তখন যেখানে সেখানে মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছে মানুষকে বন্দি করে অথবা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে। তখন কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস সরকার আর

পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পরিচালিত কংগ্রেস সরকার ছিল। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তখন তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে নকশাল দমনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন পুলিশ প্রশাসনই দেশ চালনার ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৭৪ সালে অনুমানের উপর নির্ভর করে বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে মলয়াকে লালবাজারের লক আপে আটক করে রাখে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। এই সরকার হল বিদেশি শাসকদের দেশীয় সংস্করণ। তবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নামটাই শুধু এরা বহন করে।

মলয়া তাঁর লেখায় তৎকালীন কংগ্রেস সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। তিনি বারবার বলেছেন যে ভারতবর্ষ কোনো ব্যক্তিবিশেষ অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী বা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের একেবারে নয়। কারণ কংগ্রেস সরকার তার গদি দখল করে রাখার জন্য যা ইচ্ছে তাই করবে আর কাজের হিসেব চাইলেই তখন তা রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হবে। ক্ষমতার দম্ভে এরা নীতিবোধ বিসর্জন দিয়েছে। ফলে এই সরকার ভারতবর্ষ থেকে একদিন বিদায় নেবে। কারণ এরা আইনরক্ষার নামে পুলিশি তৎপরতায় ভারতীয় নাগরিকের ওপর নৃশংশ অত্যাচার শুরু করেছিল। তিনি বলেছেন- "স্বয়ং 'মুখ্যমন্ত্রী' ৭০-এর দশকের একজন কুখ্যাত অপরাধী। তিনি গোটা দেশটার জনগণকে ছেড়ে দিয়েছেন পুলিশের হাতে।"[৩৭] সেই সময়ের পুলিশবাহিনীকে তিনি বলেছেন "ইন্দিরা গান্ধীর পা-চাটা কুকুরের দল; সরকারের কেনা দাস।"[৩৮] ফলে তৎকালীন "পুলিশ ও বিচারব্যবস্থা কংগ্রেস সরকারের তল্পিবাহকে পরিণত হয়েছিল।"[৩৯] ১৯৭৫ সালের জুন মাসে জরুরি অবস্থা জারি হয়- সারাদেশে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালের এক কলঙ্কময় ইতিহাস। সারা দেশের জেলখানাগুলো ভরে দিয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকার। পরবর্তীকালে ১৯৭৭-এর নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কংগ্রেসকে চরম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। জেল অভিজ্ঞতার ৬৪ দিনের মধ্যে মলয়া অতি দ্রুত রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে। ১৯৭৭-এ বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় এসে বন্দিদের মুক্তি দিয়েছিলেন এবং শপথ

নিয়েছিলেন মানবাধিকার শৃঙ্খলিত হতে দেবে না। 'লেখকের কথা'-তে তিনি জানিয়েছেন- "শাসকেরা বারবার ভুলে যাচ্ছে জনগণই প্রকৃত বিচারক। তাঁদের হাতেই শাসকের ক্ষমতার চাবিকাঠি।"[৪০]

রাজনীতির এক জীবন

নকশালবাড়ি আন্দোলনে সাড়া দিয়ে যে সমস্ত ছাত্র-যুবরা সমাজের আমূল রূপান্তরের কর্মকাণ্ডে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব সন্তোষ রাণা। নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান ভারতীয় রাজনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ। *রাজনীতির এক জীবন* গ্রন্থটিতে একই সঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার ভান্ডার। এই আত্মজীবনীর অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য হল সন্তোষ রাণার জন্মস্থান গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ধরমপুর গ্রামের ইতিবৃত্ত। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উড়িষ্যা-ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী এই গ্রামের সমাজ-অর্থনীতি-সাংস্কৃতিক জীবন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়েই তিনি তাঁর পারিবারিক ইতিহাসের কথা এবং ছাত্র জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সেইসঙ্গে রাজনৈতিক পশ্চাদপট রাজনৈতিক জীবনের ভিত প্রস্তুত করতে অনেকটা সহায়ক হয়েছিল।

১৯৬৬ সালেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ গণ-আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে- পরিবহন কর্মচারীদের আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন এবং সর্বোপরি খাদ্য আন্দোলন। এই আন্দোলন উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ গোটা রাজ্যকে আলোড়িত করে তুলেছিল। বামপন্থী আন্দোলনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিল এই সময়। সন্তোষ রাণা পরিবেশ, পরিস্থিতি ও বন্ধু বান্ধবদের সংস্পর্শে এসে সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেন বামপন্থী রাজনীতিতে।

১৯৬৭-র নির্বাচনে সি.পি.এমের হয়ে নির্বাচনী প্রচার, নকশালবাড়ির ঘটনার পর সরাসরিভাবে নকশালবাড়ি আন্দোলনের স্বপক্ষে নিজের সংগ্রামী অবস্থানকে দৃঢ় করা- এই সমস্ত ঘটে যাচ্ছিল খুব দ্রুততার সঙ্গে। ১৯৬৭ সালে ডিসেম্বর মাসে কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঐতিহাসিক মিটিং- এর পর তিনি জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি গবেষণা ছেড়ে গ্রামে গিয়ে সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হয়ে যান। গোপীবল্লভপুরেই সন্তোষ রাণার রাজনৈতিক কার্যকলাপের সূচনা হয়েছিল। ১৯৬৮ সালের প্রথমদিকে গ্রেপ্তার ও জেলবাসের অভিজ্ঞতা মেদিনীপুর ও দমদম সেন্ট্রাল জেলে। জেল জীবনের এই অভিজ্ঞতাকে তিনি প্রথম পর্যায়ে বিশদ বর্ণনা করেছেন। ১৯৬৯ সালের ২ মে সি.পি.আই(এম-এল) পার্টি গঠিত হওয়ার পর তিনি ডেবরা গোপীবল্লভপুর ও বহড়াগোড়ায় বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন। সাত দশকের বেশি সময় পার হয়ে এসে নিজের জীবনের কাহিনি লিখতে বসে শুরুতেই তিনি লিখেছেন- "বিপ্লবী বামপন্থায় দীক্ষিত প্রবীণ মানুষটি, তখন কি তিনি কেবল কৃষি কাজের কথাই ভেবেছেন? নাকি তাঁর চিন্তায় নিহিত সমাজবদলের তীব্র আকাঙ্ক্ষাও এরই মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছে?"[৪১] তিনি নিজের বিপ্লবী বামপন্থী জীবনের কথা লিখতে গিয়েও গভীরভাবে গণতন্ত্রের ধর্ম ও পথ নিয়ে ভেবেছেন, কথা বলেছেন। সেই গণতন্ত্রের ধারণা তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। জন স্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্র প্রসঙ্গে বলেছিলেন- "গণতন্ত্র হল গভর্নমেন্ট বাই ডিসকাশন অর্থাৎ আলোচনার মাধ্যমে শাসন।"[৪২] সন্তোষ রাণার ছোটবেলায় দেখা আদিবাসী গ্রামের অভিজ্ঞতা সেই সত্যকে চিহ্নিত করে- "আদিবাসী সমাজে নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ হলে তা মীমাংসার জন্য সভা বসত। সভায় গ্রামের সব পরিবার থেকে কেউ না কেউ যেতেন। সভায় সভাপতিত্ব করতেন গ্রামের প্রধান। তাঁর কাছে কেউ অভিযোগ করলে তিনি সভা ডাকতেন। সভা শুরু হত সন্ধ্যাবেলা। উপস্থিত সবাই আলোচনায় অংশ নিতেন। সকলে একমত হলে সভা সেই মতকেই গ্রহণ করত। কিন্তু মতভেদ দেখা দিলে পুনরায় আলোচনা হত। হয়তো গ্রামের ১০ শতাংশ মানুষ কোনও একটি

মতের স্বপক্ষে বলছেন কিন্তু ১০ শতাংশ ভিন্ন কথা বলছেন। এই অবস্থায় সভাপতি কোনও রায় দিতেন না। তিনি পুনরায় আলোচনা করতে বলতেন, যতক্ষণ না সবাই একমত হয়। কখনও কখনও ছোটখাটো বিষয় নিয়েও দু'রাত-তিনরাত আলোচনা হত এবং সবাই একমত হয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিত। সভাপতি সেটাকেই সভার রায় হিসেবে ঘোষণা করতেন।... এরকম বেশ কিছু সভা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এটা গণতন্ত্রের আদর্শ উদাহরণ।"[৪৩]

সন্তোষ রাণা লেখায় বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ- "বামপন্থী মনন এবং কাজের মধ্য দিয়েই শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে হবে; বহু অভিঘাতেও বিশ্বাস তাঁর ভাঙেনি। এবং সে কারণেই তাঁর মনে এ দেশের রাজনীতিতে বামপন্থীদের পশ্চাদসরণ নিয়ে, ধর্মচ্যুতি নিয়ে অনেক ক্ষোভ আছে, তিরস্কার আছে, কিন্তু নৈরাশ্য নেই, হাল ছেড়ে দেওয়ার আলস্য নেই। তিনি আজও বামপন্থীদের সংগ্রামী ঐক্যের উপর জোর দেন, যে ঐক্য কোনও শিলীভূত প্রজ্ঞার কেতাব থেকে পার্টি লাইন পেড়ে এনে সবাইকে সেই লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয় না, যা বহু মানুষের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার পারস্পরিক লেনদেনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে, গড়ে উঠতে থাকে। যথার্থ সাম্যবাদী চেতনার সঙ্গে এই বহুমাত্রিকতার কোনও বিরোধ তো নেইই বরং তা সেই চেতনার এক আবশ্যিক শর্ত।"[৪৪] ছয়ের দশকে বিপ্লবী রাজনীতির অনুশীলন-পর্বে এক সহ যোদ্ধা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন- "আমরা যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আনতে চাইছি সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোনও পার্টি থাকবে না। সেটা কি ভালো হবে?"[৪৫] তিনি উত্তরে বলেছিলেন- "কমিউনিস্ট পার্টি তো সকলের ভালো করবে। তাহলে আর অন্য পার্টির কী দরকার?"[৪৬] তখন সেই কমরেড প্রশ্ন করেন- "অল্প এমন কিছু লোক তো থাকতেই পারে, যারা নিজেদের ভাল বোঝে না। তারা হয়তো ভুল ভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করল। তাদের কি সেই গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে?"[৪৭] সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে যাওয়া এবং চিনে এক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করার পর এই প্রশ্নগুলো আরও উত্থাপিত হয়েছে। তিনি ভারতীয়

বামপন্থীদের মূল্যায়ন করে একটি প্রবন্ধে বলেছেন- "১৯৭৭ সালে ভারতীয় জনগণ সংসদীয় নির্বাচনকে ব্যবহার করে স্বৈরতন্ত্রী শাসনকে পরাস্ত করেছিলেন। ৩২ বছর বাদে পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই (এম)-এর একদলীয় সন্ত্রাস এবং পুঁজিপতি তোষণকারী নীতির বিরুদ্ধে মানুষ নির্বাচনকে ব্যবহার করেছেন। বামপন্থীরা যে রাজত্বের কথা বলেছেন তার মধ্যে এই অধিকারগুলো থাকবে তো? একটি অতি বামপন্থী গ্রুপ (মাওবাদীরা) দেশের কিছু এলাকায় প্রভাব বিস্তার করেছেন। সেই সব এলাকায় তাঁরা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ (এমনকি অন্যান্য বামপন্থী দলের কার্যকলাপও) নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অন্যান্য বামপন্থীরা এখনও এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেননি। আমার মতে, এটাই- এই প্রশ্নটিই আলোচনা করাটাই- ভারতে বামপন্থীদের সবচেয়ে বড় সমস্য।"[৪৮]

নকশালবাড়ি ছিল শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতদের বিদ্রোহ। সেদিক থেকে সব ধরনের শ্রেণি-সমাজে শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতদের অভ্যুত্থানে যেসব সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেগুলো নকশালবাড়িতে দেখা গিয়েছিল। অবদমিত কৃষকরা জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এলাকার জোতদাররা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল এবং কৃষকরা জমিগুলো নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিয়েছিল। কোথাও কোথাও অত্যাচারিত কৃষকরা তাদের বাড়ি ও সম্পত্তি লুট করে নিয়েছিল। নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম ছিল গোটা ভূমি ব্যবস্থাকে বদলে ফেলার একটা বৈপ্লবিক সংগ্রাম। "গোপীবল্লভপুরের গ্রামগুলোতে জোতদার-জমিদার-মহাজন যে ছবি নিজের চোখে দেখেছি তার সঙ্গে মেলাতে পারি। ... ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলেও চিনের মতো কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার অবস্থা রয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এতদিন সেরকম কৃষক আন্দোলন কেন গড়ে তোলেনি সেই প্রশ্ন আমার মনে জাগে।"[৪৯] ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস হেরে গেল এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি হল। এই নির্বাচনে দুই কমিউনিস্ট পার্টি সি.পি.আই এবং সি.পি.আই(এম) আলাদা করে নির্বাচনে লড়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের পর দুই দলই যুক্তফ্রন্টে

যোগ দিয়েছিল। সি.পি.আই(এম)- এর মধ্যে একটা অংশ ছিল যারা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারে যাওয়ার বিরোধী ছিল। ১৯৬৭ সালের মে মাসে কৃষক অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিলেন সি.পি.আই(এম)- এর নেতারা, যেমন- চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সৌরীন বসু, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখেরা। এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল আমূল ভূমি-সংস্কার। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই ঘটনায় সংকটে পড়েছিল, কারণ সরকার আইনের শাসন বজায় রাখার শপথ নিয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার বলেন যে কৃষকরা যে জমি দখল করেছে, সেগুলোতে তাদের স্বত্ব বজায় থাকবে সেরকম আইনি ব্যবস্থা করে দেবেন।

গোপীবল্লভপুর এলাকায় মে দিবসের সভার পর আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গিয়েছিল এবং রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হয়। রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হওয়ার পর বহু বামপন্থী কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। যেসব বামপন্থী কর্মী নকশালবাড়ির সমর্থক হয়েছিল তাদেরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং 'প্রিভেনটিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট' (পি.ডি.অ্যাক্ট)-এ আটক করা হয়েছিল। তখন সন্তোষ বাবুকে ক্লাসিফায়েড বলে গণ্য করা হয়েছিল অর্থাৎ তিনি জেলে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা পেয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালের ৩০ মে তিনি মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলি হয়ে গেলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি জেলে বেশিদিন আটক অবস্থায় থাকেননি। সেই সময় জেলে নকশালপন্থীদের উপর খুব বেশি কড়াকড়ি ছিল না। আবার তিনি দ্বিতীয় দফায় মেদিনীপুর জেলে গিয়েছিলেন ১৯৭২ সালে। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ১৯৭০ সালের ১৬ ডিসেম্বর পানীয় জলের সংস্থান নিয়ে বন্দিরা বিদ্রোহ করেছিল। তখন সন্তোষ রাণা জেলের বাইরে ছিলেন। সেই সময় মেদিনীপুর জেলার ডেবরা, গোপীবল্লভপুর, নারায়ণগড় ও অন্যত্র কৃষক আন্দোলনের জোয়ার চলছে। দমদম সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালীন অনেক রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সন্তোষবাবুর। এই সময়ে উৎপল দত্ত গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং দমদম সেন্ট্রাল জেলের ৩-নম্বর সেলে তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল। পরবর্তীকালে জানতে পারা যায় তিনি মুচলেখা দিয়ে

ছাড়া পেয়েছিলেন। এইসব শুনে সন্তোষবাবুর উপলব্ধি করেছিলেন- "যে বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবী আবেগ নিয়ে আসেন, তাঁদের সবাই শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে পারেন না। তাতে করে তাঁদের অবদান ছোট হয়ে যায় না।"[৫০]

কলকাতা থেকে যখন *দেশব্রতী* প্রকাশ হতে শুরু হল তখন নিয়মিত *দেশব্রতী* জেলে ঢুকত এবং চিঠিপত্র আসত। জেল কর্তৃপক্ষ যতই নিরাপত্তার কড়াকড়ি করুক না কেন, বাইরে থেকে চিঠিপত্র আদান-প্রদান কোনো দিনই বন্ধ হয়নি। এমনকি জরুরি অবস্থার সময়ে এবং কংগ্রেস শাসনের আমলেও বন্দিদের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ বন্ধ হয়নি। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে *দেশব্রতী*-তে কানু সান্যালের লেখা 'তরাই কৃষক আন্দোলনের রিপোর্ট' প্রকাশিত হয়। তখন জেলে বসে সেটা পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৬৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করে। সেই ঘটনায় চিনা কমিউনিস্ট পার্টি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মধ্যে সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে বিতর্ক দেখা দেয়। কো-অর্ডিনেশন কমিটির অধিকাংশই চিনা পার্টির মতকে সমর্থন করেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' বলে চিহ্নিত করেন। এই ঘটনার পর সি.পি.আই এবং সি.পি.আই(এম)-এর সঙ্গে নকশালপন্থীদের মতাদর্শগত পার্থক্য বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৬৮-র জানুয়ারিতে গোপীবল্লভপুরে যাওয়ার সময় সন্তোষ রাণা কোনো গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। মার্চ মাসে প্রেসিডেন্সি গ্রুপের ছেলেরা গোপীবল্লভপুরে যাওয়ার পর তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল। দমদম জেলে থাকাকালীন কো-অর্ডিনেশন কমিটির সঙ্গে যুক্ত কমরেডদের কাছে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নতুন পার্টি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরপর সন্তোষবাবু নিজস্ব চিন্তা-ভাবনায় আলাদা না থেকে নতুন পার্টিতে যোগ দেওয়ার কথা ভাবেন।

ছাত্র-যুবকদের গ্রামে যাওয়ার প্রসঙ্গে চারু মজুমদার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা গ্রামে যাওয়ার সময় যেন লুঙ্গি, গামছা এবং একটা 'রেডবুক' নিয়ে যায়। গ্রামে গিয়ে গরিব কৃষকদের সঙ্গে কৃষি কাজ করে তাদের সঙ্গে খায় এবং এইভাবে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়। এছাড়া তিনি আরও বলেছিলেন- "তুমি কৃষকের সঙ্গে যদি একাত্ম হতে পার এবং তারা অস্ত্র ধরনের ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তা হলে কোত্থেকে বন্ধুক পাওয়া যাবে সে ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে নেবে। অন্যদিকে তুমি যদি বন্দুক-পিস্তল নিয়ে গ্রামে ঢোক তা হলে তোমার চারপাশে চোর-ডাকাতেরা জড়ো হবে, কৃষকেরা জুটবে না।"[৫১] ভারতীয় কৃষকদের অপরিসীম সৃজনী ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন চারু মজুমদার। গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অসীম চ্যাটার্জী ও অন্যান্যরা চারু মজুমদারের পরামর্শ মেনে চলেছিলেন। ১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল সি.পি.আই(এম-এল) পার্টি গঠিত হয়। পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন চারু মজুমদার। কেন্দ্রীয় সাংগঠনী কমিটিতে ছিলেন কানু সান্যাল, সৌরীন বসু, সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, বিহারের সত্যনারায়ন সিংহ, উত্তর প্রদেশের শিউকুমার মিশ্র। কানু সান্যাল ১ মে কলকাতা শহিদ মিনারে পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

মেদিনীপুর জেলে থাকাকালীন অন্যান্য বন্দি কমরেডদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ঘটে সন্তোষবাবুর। তাঁর মনে হয়েছিল যে আইনি ও বে-আইনি কাজের সমন্বয় সাধন করতে গেলে অসংসদীয় সংগ্রামের সঙ্গে সংসদীয় সংগ্রামকেও যুক্ত করতে হবে। ইতিপূর্বে সি.পি.আই(এম-এল)-যে লাইন নিয়েছিল তাতে সংসদীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার কোনো সুযোগ ছিল না। অন্যদিকে নির্বাচন বয়কটের লাইনকে রণনীতিগত লাইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। সন্তোষ রাণা চারু মজুমদারের অতি-বাম লাইনের বিরোধিতা করেও সংসদীয় রাজনীতি সম্পর্কে এই অতি বাম অবস্থানে থেকে ছিলেন। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালীন মেঘনাদ, প্রদীপ ব্যানার্জীর, প্রদীপ সিংহ ঠাকুর- এঁদের সঙ্গে চিন্তাভাবনা বিনিময় করা হত। এই চিন্তাভাবনার

সঙ্গে কিছু জন সহমত হলেও অন্যান্যরা সহমত হলেন না। তখন গোপন যোগাযোগের মাধ্যম এস.এন-এর কাছে চিঠি দেওয়া হয়। চিঠির উত্তরে এস.এন লিখলেন যে সংসদীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণের চিন্তা একটা দক্ষিণপন্থী চিন্তা। জেলে অনেক দিন থাকার ফলে কমরেডদের মধ্যে যে হতাশার জন্ম হয়, তার থেকেই দক্ষিণপন্থী চিন্তা বিকাশ লাভ করেছে। সন্তোষবাবু জেল কমিটির সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেওয়ার পর প্রদীপ সিংহ ঠাকুরকে সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠিত হয়।

প্রেসিডেন্সি জেলে লাইন নিয়ে নকশাল বন্দিদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়। যারা চারু মজুমদারের লাইনের বিরোধিতা করেছিলেন তাদের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল। চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর তাঁর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যত কোনো অস্তিত্ব থাকেনি। মহাদেব মুখার্জি লিন পিয়াও- কে দিশা হিসাবে গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেছিলেন। এটাই ‘দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি’ নামে পরিচিত হল। আজিজুল হক, নিশীথ ভট্টাচার্য এই কমিটির মধ্যে ছিলেন। প্রেসিডেন্সি জেলে থাকাকালীন ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়। এর ফলে অনেক লোক জেলের ভেতরে এল। এইসময় সন্তোষ রানাকে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। জরুরি অবস্থা কে ‘বিশ দফা কর্মসূচি’র নিরিখে কিছু লোক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, “জরুরি অবস্থা ছিল একটা গরিব-দরদি ব্যবস্থা। তাঁরা এটা বোঝেন না যে গণতন্ত্র কিছুটা প্রসারিত হলে গরিব মানুষদেরও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়ে। অপরদিকে গণতন্ত্র সঙ্কুচিত হলে শ্রমজীবী মানুষদের প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়। কোনও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন যতই গরিব-দরদি কর্মসূচির কথা বলুক না কেন, তার সুফল গরিবদের কাছে পৌঁছয় না।”[৫২] শ্রেণি বিশ্লেষণ সংক্রান্ত অংশটি তাঁর লেখায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। শ্রেণি বিশ্লেষণ করার জন্য তিনি মাও সে তুং-এর চিনা সমাজের শ্রেণি বিশ্লেষণ অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- “ভারতীয় সমাজে শ্রেণিগুলোর গঠন চিনা বা ইউরোপীয় সমাজে শ্রেণিগুলোর গঠন-

বিন্যাস থেকে আলাদা।"[৫৩] কোনো ব্যক্তি কতখানি মর্যাদা ভোগ করবে সেটা তার জাতি দ্বারা নির্ধারিত। যেমন- "ভারতীয় মার্কসবাদীরা বিশেষত বাংলার মার্কসবাদীরা ভারতীয় সমাজে জাতি ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেননি। নকশালবাড়ির পর মার্কসবাদ-লেলিনবাদ চর্চার যে নতুন ধারা শুরু হল তাতে অতীতের অনেক কিছুকে প্রশ্ন করা হলেও জাতিব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা হল না।"[৫৪]

১৯৭৭-এর পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের কথা তিনি লিখেছেন। যেমন- কৃষক আন্দোলন, সেচ ব্যবস্থার দাবিতে সংগ্রাম, পি সি সি- সি.পি.আই(এম-এল) গঠন করার উদ্যোগ ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর লেখায় এসেছে দলিত আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ, ঝাড়খন্ড আন্দোলন, আসামে ৮০-র দশকের উগ্রজাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইত্যাদি। ১৯৮৬ সালে সাম্প্রদায়িকতা ও দেশের বৈচিত্রের প্রতি বিপদ সংক্রান্ত কনভেনশনের কথা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামের প্রবেশ ইত্যাদি। বিশেষভাবে বিবরণ দিয়েছেন ১৯৭৭-এর পরবর্তীতে টুকরো হয়ে যাওয়া সি.পি.আই(এম-এল) গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম গোষ্ঠী ছিল পি. সি. সি. ও সি.পি.আই(এম-এল)। কিন্তু পরবর্তীকালে এই সংগঠনগুলিতে বিভাজন ও বিভ্রান্তি দেখা গিয়েছিল। সন্তোষ রাণা যে তাত্ত্বিক প্রশ্নগুলো তুলেছেন সেগুলো কিছু নকশালপন্থী গোষ্ঠী ৮০-র মধ্যভাগ থেকে সিরিয়াস ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। সবশেষে তিনি লিখেছেন- "দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের বিপদের মুখে সমস্ত বাম, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, এ কথা আগেই বলেছি। এ প্রসঙ্গে বামপন্থী শক্তিগুলোর ঐক্যে উপর বিশেষ জোর দেওয়া দরকার।"[৫৫] আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলেছেন যে- "ইতিহাসের রেখে যাওয়া নানা সমস্যার কারণে বামপন্থী শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের কাজটি কঠিন।"[৫৬]

আজকের ভারতবর্ষ সঙ্ঘ পরিবার সরাসরিভাবে ফ্যাসিবাদী শাসন দখল করেছে- যাকে ফ্যাসিবাদের ভারতীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে। এই ফ্যাসিবাদের চরিত্র সম্পর্কে নির্দিষ্ট উপলব্ধি এবং সেই অনুযায়ী সংগঠন গড়ে তুলে রণনীতি ও রণকৌশল প্রণয়ন আমাদের সময়ের দাবি। একই সঙ্গে মূল ধারার বাম রাজনীতির বিভাজিত কাঠামোর বিরুদ্ধে তত্ত্বগত ও মতাদর্শগত সংগ্রাম চালানো সমান জরুরি।

জেলের গারদে জীবনের গান

জেলের গারদে জীবনের গান গ্রন্থটির লেখক অজিত চক্রবর্তী মাস্টারদা নামে পরিচিত। গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন যে সুধাকর রেড্ডির অনুপ্রেরণায় এই গ্রন্থ রচনা উৎসাহ পেয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্সি জেল ভাঙ্গার স্মরণীয় লড়াইয়ের কাহিনি শুনে সুধাকরবাবু লেখককে এর কাহিনি লিপিবদ্ধ করতে বলেন এবং আরও বললেন- "... এই লড়াইয়ের অংশীদার হিসাবে এখন আপনি একাই আছেন আমাদের সাথে। আপনারও বয়স হয়েছে। ভারতবর্ষে বিপ্লবী পার্টি আছে, বিপ্লবী সংগ্রাম চলছে, কমরেডরা শহীদ হচ্ছেন, জেলে যাচ্ছেন। জেলে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সংগ্রাম, বিদ্রোহ এবং তাদের নেতৃত্বে জেলজনতার সংগ্রাম- এসবই বিপ্লবের অঙ্গ। ..."[৫৭] এছাড়া স্বদেশ ঘোষ ও কালু হালদার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য- যাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে ৪২ জন বন্দিকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর লেখায় ছড়িয়ে আছে সমাজের তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসা অনেক মানুষের অসংখ্য ছোটো ছোটো কাহিনি। এই পচা-গলা, মানুষ-খেকো সমাজ ব্যবস্থার কথা, যা মানুষকে অপরাধী বানায়, উন্মাদে পরিণত করে, তিলে তিলে হত্যা করে- এইসব বিষয়গুলো জেলের গারদে জীবনের গান গ্রন্থে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এইভাবে সমাজ ব্যবস্থার অবসান ও সম্পূর্ণ ভিন্ন শোষণহীন নতুন সমাজের সৃষ্টিছাড়া অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

জেলবন্দি মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। তাই "নকশালবাড়ির ঐতিহাসিক সংগ্রামের সময় থেকে বন্দি কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সংগ্রাম এবং তাদের নেতৃত্বে জেলবন্দি জনতার সংগ্রাম অতীতের ওইসব সংগ্রামেরই ধারাবাহিক রূপ।"[৫৮] ১৯৬৭-র পর থেকে ১৯৮০-র সময়ে এ রাজ্যের বন্দি নকশালপন্থীদের আন্দোলন ও জেল ভাঙার লড়াই এবং তাদের নেতৃত্বে বন্দীদের আন্দোলনগুলো পূর্বের জেল সংগ্রামের তুলনায় অনেক উন্নত। বন্দি বিপ্লবীরা মতাদর্শগত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রশ্নে তিনটি নীতি মেনে চলার চেষ্টা করেন। সরোজ দত্তের পথ নির্দেশ অনুযায়ী বিপ্লবীরা বন্দি হবার মুহূর্ত থেকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত হয়ে বাইরের সংগ্রামে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই কাজটিকে কেন্দ্রীয় কাজ হিসাবে মেনে নিয়ে তাঁরা জেলে পার্টি সংগঠন গড়ে তুলতেন। সমস্ত রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজ এবং আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁরা মুক্তির অর্জনে একধাপ এগিয়ে যায়। ১৯৭২ সালে কমরেড চারু মজুমদার শহীদ হবার পর প্রেসিডেন্সি জেল পার্টির কমিটির নেতৃত্বে একটি লাইন হাজির করা হয়। এই লাইনের মূল কথা হল- মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্রীয় কাজ হিসাবে গ্রহন করে পার্টি গঠন করা ঠিক নয় এবং জেল কর্তৃপক্ষের আক্রমনের প্রতিবাদে লক-আপ বয়কট, গুনতি বয়কটের মতো কোনো আপোষহীন সংগ্রাম করতে হবে। এছাড়া বন্দি হওয়ার পর কোনো কমরেড বাইরের সাংগঠনিক পদে কার্যকরী থাকত না। ফলে জেলের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজে যারা অংশগ্রহণ করত, তাদের নিয়েই গড়ে তোলা হত জেল পার্টি নেতৃত্ব। কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষার আলোকে বিপ্লবীরা মনে করতেন যে জেলবন্দি জনগণও ভারতীয় জনগণের অংশ। তাই তাদের মত জেলের সাধারণ খাবার খেতে হবে।

১৯৭৯-র প্রথম থেকেই দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি পরিচালিত সি.পি.আই(এম-এল)- এর নেতৃত্বে এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় যে বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল, তা ১৯৮২-র মাঝামাঝিতে সে সংগ্রাম পরাজিত হয়েছিল। অজিত চক্রবর্তী এই ঘটনার আগেই জেলে ঢুকেছিলেন। তিনি

পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ না করেই বন্দি গরিব কৃষকদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে জেল থেকে পালিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রাম ব্যর্থ হলে সি.পি.আই- এর নেতৃত্বে সেই সংগ্রাম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছে। পার্টির নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে গণমুক্তি গেরিলা বাহিনী। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ব্যাপ্তি ও গভীরতায় তৈরি হয়েছে গেরিলা অঞ্চল। ১৯৭৮ থেকে পশ্চিমবাংলা বিহার ও উত্তর প্রদেশের গরিব-ভূমিহীন-কৃষকের নেতৃত্বে সি.পি.আই(এম-এল)- এর পরিচালনায় গেরিলা সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে, বিশেষত প্রেসিডেন্সি জেলে রাজবন্দিরা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। যেমন- No Party Line, কানু সান্যাল-SNS লাইন, চারু মজুমদার প্রোলিন পিয়াও লাইন, চারু মজুমদার অ্যান্টি লিন পিয়াও লাইন ইত্যাদি। অজিত চক্রবর্তী ছিলেন চারু মজুমদার প্রোলিন লাইনের অনুগামী।

তাঁর লেখায় বিপ্লবী জীবনের কথা আছে। বন্দি জীবনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারণ বন্দিদের নিয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নানা কাহিনি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর বিপ্লবী সহযোদ্ধাদের কথা উঠে এসেছে, যেমন- নিরঞ্জন, গৌরাঙ্গ, নিশীথদা, প্রদীপ, সুনীল, পলাশ, রেবতী, আজিজুল, গৌড়দা এবং আরো অনেকে। ১৯৭৬-এ জেল ভাঙার পরিকল্পনা যখন বলা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন- "আমাকে নিয়ে তোমাদের কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না। দেখো আমি দিব্বি সাঁতরে পেরিয়ে কালিগঙ্গা...।"[৫৯] প্রেসিডেন্সি জেল ভাঙ্গার কিছুদিন পর ধরা পড়ে তাঁরা অনেকেই আলিপুর স্পেশাল জেলে বন্দি ছিলেন। কর্তৃপক্ষ অজিতবাবুকে সেলে না ঢুকিয়ে আমদানি ফাইলে আটকে রাখল। হাসপাতাল থেকে মিষ্টি হেসে বলেছিল- "আমদানি ফাইলেই থাকুন, সেলে কেউ থাকে না। বয়স্ক মানুষ; একা থাকতে কষ্ট হবে।"[৬০]

সেলের মধ্যে বন্দি অবস্থায় থাকাকালীন সমস্ত মন জুড়ে অজিতবাবুর ছোটো-বড়ো ছড়ানো স্মৃতিগুলো ভিড় করতে থাকে। তিনি নিজেকে এক মুহূর্ত একা ভাবেন না। তিনি মনে করেন-

“একের পর এক স্মৃতির গলিপথ আমি পার হয়ে যাচ্ছি; চলার পথে দুপাশের শ্রেণিবদ্ধ আমার কত না দিন আর রাতের স্মৃতির পসরা। বর্তমানের যা কিছুর দিকে আমি তাকাই, সে-ই আমাকে নিয়ে যায় অতীতের অলিতে গলিতে। পথের দুপাশে যেদিকে তাকাই, নানা স্মৃতি নানা বেশে জীবন্ত হয়, এগিয়ে আসে, দুই হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে, সম্মোহিত আমি, নির্বারিত বেগে ছুটে যাই, ঝাঁপিয়ে পড়ি তাদের আলিঙ্গনে, আমি বিলীন হয়ে যায়। এভাবেই অতীত আর বর্তমানে ডুব সাঁতার কেটে কেটে আমার দিন যায় রাত আসে, রাত যায়, দিন আসে...।”[৬১] বন্দিদের জানা-চেনা, তাদের মধ্যে খেটে খাওয়া মানুষের রাজ বানানোর রাজনীতি, জনগণের আত্মদানের মতাদর্শ প্রচারের ফলাফল সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা- এসব ব্যাপারে প্রেসিডেন্সি জেল ছিল কমরেডদের বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭৩-১৯৭৬-এর প্রথম পর্যন্ত সময়কালে লড়াই করে সব ধরনের বন্দিদের ও আটকদের মধ্যে জেল থেকে রাজনীতি প্রচারের চেষ্টা, তাদের সঙ্গে নিয়মিত ভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান, মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা হত। ফলে সেল, হাসপাতাল, চৌকা প্রভৃতি কাজের ক্ষেত্রেই বন্দিদের মধ্যে প্রচারের কাজ যেমন চলত, তেমন ওয়ার্ডে কমরেডরা সে কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখত। সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের সঙ্গে সতর্কতার সাথে রাজনৈতিক কাজকর্ম করা হত জেলের অভ্যন্তরে। বিচারাধীন এবং সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের উপর নির্ভর করেই জেলের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ছড়িয়ে থাকা সংগঠনগুলির এবং মহিলা কমরেডদের সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে উঠত। প্রেসিডেন্সি জেল, হাওড়া জেলা সহ বিভিন্ন জেলে এই বন্দিরা জেল পালানোর লড়াইয়ে আমাদের সাথী হয়েছে। জেল থেকে বেরিয়ে এই সব বন্ধুদের অনেকেই চুরি-ছিনতাই ইত্যাদিতে আবার জড়িয়ে পড়েছে। তবে ধরা পড়ে গেলে সে আগের মতোই মনে-প্রাণে পার্টির গোপন কাজকর্ম করে গেছে।

তথ্যসূত্র :

১. আদিত্য চৌধুরী, *বাংলা কারাসাহিত্য,* মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ৫ সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবস, ১৯৯১, পৃষ্ঠা. ২৪-২৫

২. *চর্চা,* 'নকশালবাড়ি : বিস্মরণের বিপরীতে (ক্রোড়পত্র)', কলকাতা, তৃতীয় পরিসর প্রকাশনা, প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৭, অসীমকুমার হালদার(সম্পাদক), পৃষ্ঠা. ১৮৫

৩. আজিজুল হক, *কারাগারে ১৮ বছর (প্রথম* ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৬, আমার কৈফিয়ত

৪. আজিজুল হক, *কারাগারে ১৮ বছর,* পূর্বোক্ত, অখন্ড সংস্করণের জন্য

৫. প্রদীপ বসু (সম্পা.), *মননে সৃজনে নকশালবাড়ি,* কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ২০১২, পৃষ্ঠা. ৮৫

৬. আজিজুল হক, *কারাগারে ১৮ বছর (প্রথম* ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫০

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৬৮

৮. প্রদীপ বসু (সম্পা.), *মননে সৃজনে নকশালবাড়ি,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮৬

৯. আজিজুল হক, *কারাগারে ১৮ বছর (প্রথম* ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৩

১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৯

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫০

১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৬৯

১৩. পূর্বোক্ত

১৪. পূর্বোক্ত

১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৭০

১৬. পূর্বোক্ত

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৯

১৮. প্রদীপ বসু (সম্পা.), *মননে সৃজনে নকশালবাড়ি,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮৯

১৯. আজিজুল হক, *কারাগারে ১৮ বছর (প্রথম* ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৭২

২০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭০

২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৪

২৩. আজিজুল হক, *কারাগারে ১৮ বছর (প্রথম* ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), পূর্বোক্ত, অখন্ড সংস্করণের জন্য

২৪. আজিজুল হক, *কারাগারে ১৮ বছর (প্রথম* ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৯৯

২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১০৪

২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১০৬

২৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১০৭

২৮. প্রদীপ বসু (সম্পা.), *মননে সৃজনে নকশালবাড়ি,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৯১

২৯. আজিজুল হক, *কারাগারে ১৮ বছর (প্রথম* ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮৪

৩০. প্রদীপ বসু (সম্পা.), *মননে সৃজনে নকশালবাড়ি,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৯৩

৩১. আজিজুল হক, *কারাগারে ১৮ বছর (প্রথম* ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৪৮

৩২. *গাঙচিল পত্রিকা,* 'নকশাল', কলকাতা, বইমেলা ২০১৮, তৃতীয় সংখ্যা, অধীর বিশ্বাস (সম্পা.), পৃষ্ঠা. ১৩৫

৩৩. মীনাক্ষী সেন, *জেলের ভেতর জেল,* কলকাতা, পিপলস্ বুক সোসাইটি, প্রথম পি.বি.এস.প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৩, আমার কৈফিয়ত

৩৪. মীনাক্ষী সেন, *জেলের ভেতর জেল,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮৬

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮৩

৩৬. মলয়া ঘোষ, *লালবাজারে ৬৪ দিন,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা. ৩

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৩

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৯

৩৯. পূর্বোক্ত, 'লেখকের কথা'

৪০. পূর্বোক্ত

৪১. সন্তোষ রাণা, *রাজনীতির এক জীবন,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮, আর জাগে প্রশ্নমালা

৪২. পূর্বোক্ত

৪৩. পূর্বোক্ত

৪৪. পূর্বোক্ত

৪৫. পূর্বোক্ত

৪৬. পূর্বোক্ত

৪৭. পূর্বোক্ত

৪৮. পূর্বোক্ত

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা.১০১

৫০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৬

৫১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৩

৫২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২১৯

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫১

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫১

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩২৩

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩২৪

৫৭. অজিত চক্রবর্তী, *জেলের গারদে জীবনের গান,* কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬, লেখকের কথা

৫৮. অজিত চক্রবর্তী, *জেলের গারদে জীবনের গান,* পূর্বোক্ত, ভূমিকা

৫৯. *বিতর্কিতা,* প্রসঙ্গ : কারা-সাহিত্য, কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, আগস্ট ২০১৬, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা. ১৬৭

৬০. অজিত চক্রবর্তী, *জেলের গারদে জীবনের গান,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৯

৬১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১০

চতুর্থ অধ্যায়

জেলস্মৃতি : স্বতন্ত্র সাহিত্য হিসেবে মূল্যায়ন

জেলস্মৃতি : স্বতন্ত্র সাহিত্য হিসেবে মূল্যায়ন

সাহিত্যিক মূল্যায়নের কোনো প্রথাসিদ্ধ ধারা নেই। সমালোচক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস্তববাদী, অতিবাস্তববাদী, ভাববাদী বা রসবাদী এরকম নানা শ্রেণিভেদ থাকলেও সমালোচনার মূল্যমানের এমন কোনো মানদন্ড নেই যার সাপেক্ষে যথার্থ সাহিত্যমূল্য নিরুপিত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যিক মূল্যায়নে গ্রন্থের সমজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক মূল্যায়নও এসে পড়ে। অধিকাংশ গ্রন্থে সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপনায়, বিষয় নির্বাচনে, চরিত্র চিত্রণে পটভূমির অনুষঙ্গ হিসেবে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা যুক্ত হয়েছে। বস্তুত আলোচ্য গ্রন্থগুলির শতকরা আশি ভাগই স্মৃতিকথা। লেখক সম্প্রদায়ের অধিকাংশই সমাজসেবী, রাজনৈতিককর্মী। বন্দিদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বদেশচিন্তা, বন্দিমনের একান্ত ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া, জেল পরিবেশ, বিভিন্ন ধরনের বন্দি-চরিত্র, জেল কর্মচারী ও বন্দিদের পারস্পারিক সম্পর্ক, জেলজীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, ব্যক্তি জীবনের সাধারণ যৌন চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র) ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ কখনো সাহিত্যিকের, কখনো সমাজতাত্ত্বিকের, আবার কখনো সাধারণ বন্দির দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। জেলজগৎ আধুনিক সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করার ও নিরাপদ রাখার তাগিদে সৃষ্ট এমন এক জগৎ, সে জগতের কথা যখন সাহিত্যের অঙ্গনে এসে আঘাত করে তখন সেই সাহিত্যে রূপান্তরিত জেলজীবনের কথা কেমনভাবে এবং কোন গভীরতার স্তরে প্রকাশিত হল- সাহিত্যিক মূল্যায়নে সেটাই হবে শেষ কথা।

সাতের দশকের যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আমাদের আলোচ্য জেলস্মৃতিগুলো গড়ে উঠেছে সেই দেশ ও কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থানান্তর ঘটেছে। পটভূমির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাসনযন্ত্র, জেলব্যবস্থা, জেল পরিবেশ এবং রাজনৈতিক বন্দির গুণগত পরিবর্তন স্বাভাবিক। এখানে মনে রাখা দরকার জেলস্মৃতি হল রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাহিত্য নয়। যে বিশেষ কারণে তাঁরা জেলে গিয়েছিলেন তার পিছনে রয়েছে জাতির মুক্তির স্বপ্ন, যে স্বপ্নের

বাস্তব রূপায়নের জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবোধকে তাঁরা তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন এবং জেলবাস করেছেন একাধিকবার। গ্রন্থগুলির একদিকে যেমন ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্যবদ্ধ অপরদিকে শুদ্ধমনের প্রতিফলনে সৃষ্টি হয়েছে এক সাহিত্যিক মূল্য। সুতরাং জেলস্মৃতিগুলোর নান্দনিক, ঐতিহাসিক সৌন্দর্যমূল্য কম নয়। সাহিত্যের একটা নতুন ধারা তৈরি হয়েছে কারাসাহিত্য। সেটার বিষয়বস্তু হিসেবে জেলস্মৃতিগুলি আমাদের কাছে চিরস্থায়ী সৌন্দর্যের আলোকবর্তিকা হিসেবে দেখা দেবে। তাই বলা যেতে পারে- "Sufferings can be justified if it becomes raw material for beauty."[১]

স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ পর্বে জেলখানার কাহিনি বাংলা সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র শাখা হয়ে উঠেছে। জেলখানা ও জেলখানার অভিজ্ঞতা নিয়ে বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে। কিন্তু এখানে সেইসব লেখার কথা বলব যেগুলো লেখকেরা জেল থেকে বেরিয়ে লিখেছেন জেলের স্মৃতি হিসেবে। জেলখানা হল একটি সংগঠন। তার সঙ্গে আইন, সরকার ও দেশের সম্পর্ক অনেক সরাসরি। জেলখানার ভেতরে বিভিন্ন অপরাধে আটক বন্দিদের ভেতরেও থাকে দেশের নানা শ্রেণির, নানা বৃত্তির মানুষ। ফলে জেলখানার মানুষের সেই কাহিনিতে দেশের মানুষের এমন অনেক খবর পাওয়া যেতে পারে, যা জেলখানার বাইরের কাহিনিতে সবসময় পাওয়া কঠিন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের নানা কর্মী বেশিরভাগ সময় বিচারাধীন বন্দি হিসেবে অনেকটা সময় জেলে কাটিয়েছেন। তাঁরা জেলখানার ভেতরে থেকে মানুষজনকে ও জেলখানার ব্যবস্থাকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। সুতরাং নকশালবাদীদের লেখা জেলখানার সাহিত্য আমাদের কাছে একমাত্র দলিল- যা স্বাধীনতার পরের আইন-নাগরিক-জেলখানার সম্পর্ককে বোঝা যায়। আলোচ্য স্মৃতিকথাগুলোতে একটা বিশেষ দিক লক্ষ্য করা যায়। যেটা হল মেয়েদের লেখা জেলস্মৃতি এবং ছেলেদের লেখা জেলস্মৃতিতে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। মেয়েদের লেখা জেলস্মৃতিকথায় প্রায় সবসময় সহবন্দিদের অবস্থান এবং তাদের উপর অত্যাচারের বর্ণনা নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু

ছেলেদের লেখা জেলস্মৃতিগুলিকে বিশেষত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা, তাঁদের নিজেদের কথা, তাঁদের মতাদর্শের কথা এবং মতাদর্শের সাপেক্ষে নিজেদের মধ্যে তুলনার কথা অনেক বেশি করে ধরা পড়েছে। সেই তুলনায় পাশাপাশি বন্দিদের কথা তেমন লিপিবদ্ধ হয়নি। অন্যদিকে মেয়েদের লেখায় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শ ইত্যাদি প্রায় নেই বললেই চলে।

নকশালবাড়ি আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৬৭-১৯৭২ এই সময়টা ছিল প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রত্যাঘাতের সময়। এই সময় একটা স্লোগান সাধারণ মানুষের মনে, বিশেষত মহিলাদের মনে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল- "নিজেকে বদলাও, পৃথিবীকে বদলাও।"[২] পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোনো আন্দোলনের পেছনে নারীদের আত্মত্যাগের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের শুরু থেকেই মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও গুরুত্বপূর্ণ। নকশাল আন্দোলনে মূলত দুই ধরনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি থেকে আসা মেয়েরা যুক্ত হয়। এক, স্থানীয় চাষী পরিবারের মেয়েরা; দুই, শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা শিক্ষিত মেয়েরা। নকশালবাড়ির কৃষক ও আদিবাসী মেয়েরা সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছিলেন জমির লড়াইয়ে। শহুরে ছাত্রী ও যুবতীরা নকশাল আন্দোলনের ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের পরিবার, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় আন্দোলনের সঙ্গী হয়েছিলেন। তাঁরা মূলত তিনটি ধারা থেকে এসেছিলেন। প্রথম, কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট ছাত্র-রাজনীতির ভাঙ্গনের ও বিদ্রোহের মধ্য থেকে অনেক নারী নকশাল কর্মী হয়ে উঠেছিলেন। দ্বিতীয়, নকশাল পুরুষ কর্মীদের প্রভাবে তাদের বন্ধু, বোন বা প্রেমিকারাও অনেক সময় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তৃতীয়, গ্রামের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা বা না থাকা সাধারণ গ্রামীণ এবং আদিবাসী নারীরা। এরাই ছিলেন রাজনীতিতে নতুন এবং এদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৯৬৭ সালের ২৫ মে প্রসাদজোতে কৃষক-পুলিশের সংঘর্ষে যে নয়জন শহীদ হয়েছিলেন তার মধ্যে সাতজনই মহিলা।

নকশালপন্থী সংগঠনের দু'রকম কাজ ছিল- টেকনিক্যাল ও অর্গানাইজেশনাল। নকশালবাড়ি আন্দোলনে যে মেয়েরা যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগই কাজ ছিল টেকনিক্যাল। মূলত তাঁরা ক্যুরিয়ারের ভূমিকা পালন করতেন। চিঠিপত্র, অস্ত্র এবং সংবাদ আদান-প্রদানের কাজের দায়িত্ব থাকত তাঁদের উপর। খুব কম সংখ্যক মেয়েকেই সরাসরি সাংগঠনিক কাজে নিয়োগ করা হত। যাঁরা সরাসরি সাংগঠনিক কাজ করতেন তাঁদের কাজ ছিল কৃষক-শ্রমিকের কাছে নিজেদের মতবাদ পৌঁছে দেওয়া বা সরাসরি শ্রেণিশত্রু নিধনের জন্য প্রয়োজনীয় স্কোয়ার্ড তৈরি করা। পুলিশের অত্যাচারে যখন গ্রামগুলি পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে, তখন মেয়েরা একাধারে মেয়েদের এবং পুরুষদের ভূমিকায় কাজ করেছেন। সন্তানদের দেখাশোনা, সংসারের যাবতীয় কাজ, চাষ-আবাদ, রাজনীতি ইত্যাদি সবদিক সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন। তাই আন্দোলনে শুধু যে পুরুষরা অংশ নিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, রাষ্ট্রের দমন পীড়নের শিকার হয়েছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন তা নয়। সমকালের অনেক নারী মধ্যবিত্ত পরিবারতন্ত্রের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে পা দিয়েছিলেন। কিন্তু নকশালবাড়ি আন্দোলনের ইতিহাস সুকৌশলে তাঁদের অবদানকে সরিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য- "আন্তর্জাতিক বিশ্বে ছ'য়ের দশক নারী স্বাধীনতা, নারীর আইনগত এবং সামাজিক সাম্য অর্জনের লক্ষ্যে লড়াইয়ের কাল।"[৩] "ষাট-সত্তরের ছাত্র আন্দোলন প্রভাবিত করেছিল এই সময়ের নারীবাদী চিন্তাকে।"[৪] শহরের নারী নকশালকর্মীরা নিজেদের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সকলের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের জন্য লড়েছেন। সব রকম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মুখে দাঁড়িয়েও কেউ দলের গোপন কোনো তথ্য জানিয়ে দেন নি, নত হননি ক্ষমতার দম্ভের কাছে।

চারু মজুমদার লিখেছেন যে "নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্তৃত্ববিহীন নেতৃত্ব হয় না।"[৫] কার্যত নকশাল আন্দোলনে পুরুষদের হাতে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দুটোই ছিল। সেই গুটিকয়েক পুরুষ ব্যতিরেখে নকশাল আন্দোলনে মেয়েরা, সাধারণ মানুষ,

তাদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান সব কিছুই হারিয়ে গেছে কর্তৃত্বের আড়ালে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই যে সি.পি.আই(এম-এল)-এর নেতাদের লেখা পার্টি ডকুমেন্ট, লিফলেট ও বিভিন্ন রকম রচনার মধ্যে নারী কর্মীদের প্রতি অবমাননার নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করা যায়। নকশাল আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা চারু মজুমদার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠিকে উদ্দেশ্য করে অনেক লিখেছেন। কিন্তু মেয়েদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত আন্দোলনে কিংবা তাঁদের প্রতি পার্টির কি মনোভাব থাকা দরকার- সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। মাও-সে-তুং তৎকালীন চিনা কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্ব মনে করতেন যে মেয়েদের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন ব্যতীত মানব মুক্তি সম্ভব নয়।

নকশালবাড়ি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক মহিলা স্বভাব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। তাঁরা প্রত্যেকে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। স্থানীয়ভাবে তা যেমন জোতদার, তাদের লেঠেল বাহিনী, পুলিশ-প্রশাসনের ভয়ংকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। এই লড়াইয়ে যে সাহস, বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যয়, কষ্টস্বীকার প্রয়োজন- তাঁরা সমস্ত বিষয়ে অবগত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শরিক ছিলেন কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন- "নকশাল আন্দোলনের যখন যোগ দিয়েছিলাম তখন মেয়ে নয় কর্মী পরিচয়টাই প্রধান ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পার্টির কার্যক্রম বুঝিয়ে দিয়েছে আমরা 'মেয়ে'। আমরা জেনে এসেছিলাম পুরনো সব সামন্ততান্ত্রিক ধারণাকে গুঁড়িয়ে দিতে চায় নকশালবাদ। যখন পার্টির মধ্যেই মেয়েদের জন্য লক্ষণরেখা টেনে দেয়া হল, তখন সত্যিই মনে হয়েছিল আমরা কি ভুল করেছি নিজেদের পরিবার, কেরিয়ার সব ছেড়ে এসে?"[৬] উদ্দীপনা আর ভাবনার বশবর্তী হয়ে নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন- "জেলে পুলিশের মার খেয়েছি প্রবলভাবে, কিন্তু সেই মারটা নয় মনে রেখেছি, সেই মারের মুখে দাঁড়িয়ে গড়ে তোলা প্রতিরোধ। আর সংগঠনের মধ্যে সহ-কমরেডরা অনেক সময় অনেক অশালীন আচরণ করেছেন মেয়েদের সঙ্গে এটা যেমন বলা হয়

তেমনি সেই অন্যায়ের প্রতিবাদও করেছেন বাকি কমরেডরা। সর্বোপরি তারাও আত্মসমালোচনার পথ খোলা রেখেছেন চিরকাল। নকশাল আন্দোলনের যে মূল প্রবণতা ছিল প্রচলিত স্থিতাবস্থার বিরোধিতা করা...মেয়েদের ভূমিকার ক্ষেত্রেও সেটাই বজায় ছিল।"[৭] এছাড়া তিনি নিজের অভিজ্ঞতা, ভাবনা সমস্ত কিছুকে সাথে নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছেন এইভাবে- "সত্তরের বাঙালি সমাজে পুরুষের যে একাধিপত্য ক্রিয়াশীল ছিল তারই ছোঁয়া লেগেছিল স্বাভাবিকভাবে নকশালপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে। ফারাক এক জায়গাতেই, পরিবারে সেই ক্ষমতার দর্পের কোনও প্রতিবাদ হত না, কিন্তু পার্টিতে হত, অন্তত সেই চেষ্টা ছিল।"[৮]

মানবী ইতিহাসের একমাত্র লক্ষ্য ইতিহাসের মধ্যে মহিলাদের অবস্থান পুনরুদ্ধার করা নয়, মহিলাদের দিয়ে ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করা। নারী জীবনের বহমানতাকে যেমন বরাবর সমাজ-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক স্থাপনগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে, ঠিক একইভাবে বৃহৎ আন্দোলন ও প্রতিবাদের ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হয়েছে নারী-স্বর। রাজনৈতিকভাবে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন এবং লিঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্মাণের বিপক্ষে কথা বলা কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরেও, সমাজের অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মতো পুরুষতান্ত্রিক প্রবণতা কাজ করেছে। যেমন- "আন্দোলনে বহু মহিলা যোগদান করলেও তাদের জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্মভারের কথা পার্টির পক্ষ থেকে কখনওই বলা হয়নি। পার্টি নেতৃত্বে পুরুষদের ব্যাপক আধিক্য থাকায় পুরুষতান্ত্রিক ঝোঁক অনিবার্য ছিল। 'বিপ্লবের সময় কোনও কাজই উপেক্ষণীয় নয়' সুতরাং আমাদের বলা হল বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে, চা-জল-খাবার দিতে, প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র ও নথি আদান-প্রদান করতে ইত্যাদি। এছাড়াও আমাদের আরও কিছু দায়িত্ব ছিল, যেমন নার্সের ট্রেনিং নেওয়া যাতে আমরা আমাদের আহত পুরুষ কমরেডদের সেবাশুশ্রূষা করে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে পারি। ভাগ্যিস আমরা স্বভাবগত ভাবেই 'যত্নশীলা', 'মায়াময়ী', 'মমতার খনি' ইত্যাদি- এটা পুরুষ কমরেডদের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ পুলিশরাও জানে! আমরা তাই কখনওই আইনের চোখে সন্দেহের

পাত্র ছিলাম না।... কিছু মাস পরে যখন পুলিশের খাতায় আমার নাম উঠল আরও বেশ কিছু মহিলার সঙ্গে, মনে হল- অন্তত পুলিশ আমাদের 'শত্রু' হওয়ার যোগ্য মনে করেছে। ভয়ের থেকে ঢের বেশি স্বস্তির কারণ ছিল মাঝরাতে সেইসব পালিয়ে যাওয়ার মুহূর্তগুলো।"[৯]

১৯৬৭ সালে প্রসাদজোতের শিশু, নারী হত্যার ঘটনা নারীদের মধ্যে প্রতিরোধের ভাবনা আরও তীব্র আকার ধারণ করল। ফলে নারীদের সক্রিয়তা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু নারীদের ব্যবহার করা হল পুরুষ কমরেডদের রক্ষা করার কাজে। নারীদের নেতৃত্বের পর্যায়ে তুলে তাদের নিজেদের সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হল না। এখানেও পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রাধান্য পেল। ১৯৬৯ সাল থেকে গেরিলা দলে অনেক নারী কমরেড যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু পার্টি নেতৃত্বের রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, মতাদর্শ, রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ব্যর্থতা এবং সর্বোপরি পার্টির মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও-সে-তুং-এর চিন্তা ধারাকে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে প্রয়োগের ব্যর্থতার জন্য যেসব নারী কমরেডরা গেরিলা দলে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা আবার ঘরে ফিরে গেলেন, কেউ জেলে গেলেন। নেতারা এলাকা ছেড়ে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য অন্য জায়গায় চলে গেলেন। এই অভ্যুত্থানের সময় নারী নির্যাতন, চুরি, ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধগুলি লোপ পেয়েছিল। গ্রামগুলি এই সময় এক একটি কমিউনের চেহারা নিয়েছিল। ব্যক্তি প্রাধান্য লোপ পেয়ে অভ্যুত্থানকে প্রাধান্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল যাবতীয় ভাবনা-চিন্তার কাজকর্ম।

নকশালবাড়ি আন্দোলনে মহিলাদের অবদান সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়। তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় দ্বিতীয় স্তরে থাকা মহিলাদের শ্রেণি নির্বিশেষে যে স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ছিল, নকশালবাড়ি আন্দোলনের তার ভূমিকা কম নয়। কোথাও মহিলারা সরাসরি গেরিলা আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কোথাও আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন,

কখনো সাধারণ কর্মীরূপে যোগদান করেছিলেন আবার কখনো নারীর ভূমিকা ছিল প্রচ্ছন্ন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। নকশালবাড়ি আন্দোলনের বহু বিভক্ত পথ ও মত অবরুদ্ধ করেছিল মেয়েদের গতি। এই রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন কানু সান্যালের একনিষ্ঠ শিষ্যা শান্তি মুন্ডা। তিনি ছোট ছোট সমাবেশে ভাষণ দিয়ে মহিলাদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। "গ্রাম পাহারা দেওয়া বিরোধীদের খাওয়া-দাওয়া ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা প্রচন্ড পুলিশি সন্ত্রাসের মুখে মহিলাদের মনোভাব অটুট রাখা- এই সব কাজ শান্তি সাহসের সঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে করেছেন।"[১০]

বীরভূম জেলায় নকশালবাড়ির লড়াই শাসকের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। এই জেলাতে অনেক কৃষক-রমণী, ছাত্রী, যুবতী লড়াইয়ে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই লড়াইয়ে পুরুষ কমরেডদের ন্যায় নারী কমরেডদেরও পুলিশি নির্যাতন, দীর্ঘ জেলবাসের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। প্রত্যক্ষ আন্দোলনকারী ব্যতীত বেশ কিছু নারীর কথা নকশাল কর্মীদের স্মৃতিচারণায় ব্যক্ত হয়েছে, যাঁরা পরোক্ষভাবে এই সুবিশাল কর্মকান্ডে যোগদান করেছিলেন। শৈলেন মিশ্রর লেখায় উঠে এসেছে তাঁদের মায়েদের কথা। তিনি নকশাল কর্মীর মায়েদের স্মরণ করে বলেছেন- "আমাদের মায়েরা ছিলেন বিশাল হৃদয়ের অধিকারিণী। সবাই যেন তাঁদের সন্তান। অকৃপণ ও নিঃস্বার্থ স্নেহ ঝরে পড়ত আমাদের উপর।"[১১] শৈলেন মিশ্র এ প্রসঙ্গে গোপালের মা, মণির মা-এর কথা বলেছেন। গোপালের বাড়িতে শৈলেন মিশ্রর অবাধ যাতায়াত ছিল। গোপালের মা বলেছিলেন- "যখন খুশি তোমরা এসো কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রক্তপাত যত পার কম করো।"[১২] মনির মা ছেলেসহ প্রত্যেক কর্মীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনিও প্রায় একই ধরনের কথা বলেছিলেন- "আমরা রক্তপাত চাই না। আমরা রক্তপিপাসু দানব নই। আমরা এক শোষনমুক্ত গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে চাই। রাষ্ট্রই তার থাবা বসিয়েছে বিপ্লবী কর্মী ও জনগণের ওপর। আমরা এটাকে প্রতিহত করছি মাত্র।"[১৩] শৈলেনের মা অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন

প্রত্যেক কর্মীর প্রতি। তাই তিনি সকলের মা হয়ে উঠেছিলেন। এই সব মায়েরা উপস্থিত বুদ্ধির মাধ্যমে কর্মীদের সংবাদ গোপন করেন। পুলিশ বাহিনী ঘর সার্চ করতে চাইলে শৈলেনের মা বলেছিলেন- "আপনারা সার্চ করুন, তবে আপনাদের জুতোগুলো খুলতে হবে। উপরে ঠাকুরঘর। শালিগ্রাম শিলা আছে। পুলিশ উপর ঘর সার্চ না করে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল।"[১৪] শৈলেন মিশ্র এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন- "মায়েরা এরকম অনেক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন এবং উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতিও সামলেছেন।"[১৫] এছাড়া এ প্রসঙ্গে শৈলেন মিশ্র সাধারণ মেয়েদের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন- "আমাকে তো আগে মারবে, তুমি ছোটো, তুমি পালাও।"[১৬]

শুধু গ্রামাঞ্চল নয়, কলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের যুবক-যুবতীরা ছয়-সাত দশকের আন্দোলনে মুখর হয়ে উঠেছিল। মিটিং, মিছিল, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ সর্বত্র মেয়েদের সমান অংশগ্রহণ অব্যাহত ছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিমিরবরণ সিংহ বহরমপুর জেলে পুলিশের অত্যাচারে নিহত হয়েছিলেন। তিমিরের মৃত্যুতে শঙ্খ ঘোষ কয়েকটি ছত্র লিখেছিলেন-

"ময়দান ভারী হয়ে নামে কুয়াশায়
দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ
তার মাঝখানে পথে পড়ে আছে ও কি কৃষ্ণচূড়া?
নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নিই
তোমার ছিন্ন শির, তিমির।"[১৭]

নকশালবাড়ি আন্দোলনকে চরমভাবে মোকাবিলা করেছিল পুলিশ। বাংলাদেশের লোকেরা পুলিশ সম্পর্কে বলে থাকেন- "'পাজি'র প, 'লোচ্চার, ল, আর 'শয়তানে'র শ নিয়ে 'উ' দিককার পানি 'ই' দিক করেই তৈরি হয়েছে 'পুলিশ'!"[১৮]

নকশাল মেয়েদের গণসংগ্রামের আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে দেশজুড়ে। বাংলার গোপীবল্লভপুরে মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের চিত্র পাওয়া যায় ১৯৬৭ সালে এবং তার পরবর্তীকালে। নকশালবাড়ি আন্দোলনে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী নারীরা ব্যাপকভাবে যোগদান করেছিলেন। সন্তোষ রাণার কথা অনুযায়ী- "তাঁদের ওপরেও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরাট বোঝা ও তার ওপরে পরিবারে পিতৃতান্ত্রিক শোষণের বোঝা ছিল। কৃষক আন্দোলন তাই নারীদের মধ্যে বিরাট সাড়া জাগায়। সংগঠন করার সময় থেকেই তাঁরা নানা ভাবে সাহায্য করতে থাকেন। প্রকৃত অর্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধানকাটার আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন এক গ্রামের মহিলারাই। কিছু মহিলা কর্মী নেতৃস্থানীয় ভূমিকাও নেন।"[১৯] সাধারণভাবে গণ-সংগঠন বর্জন করা ছাড়াও নারীদের সমস্যাটিকে যে পৃথকভাবে দেখার প্রয়োজন আছে সে ধারণা সি.পি.আই(এম-এল)-এর ছিল না। মাও-সে-তুং- এর লেখায় জানা যায় যে "চিনে শ্রমজীবী পুরুষেরা যেখানে তিনটি পাহাড়-এর (সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ) শোষণে জর্জরিত, সেখানে নারীসমস্যা আরও একটি বাড়তি পাহাড়।"[২০] পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে শোষণ-মুক্তির সংগ্রাম সফল হতে পারে না। এগুলো সি.পি.আই(এম-এল) আত্মস্থ করেনি। তাই নারী আন্দোলন যে সমাজের পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক বিকাশের পূর্বশর্ত, সেটা উপলব্ধিতে আসেনি। একটা ধারণা ছিল যে শ্রেণি শোষণ দূর হয়ে গেলে শোষণের অন্যান্য ধরনগুলি নিজে থেকে ভেঙে যাবে। ১৯৮০-র দশকে পশ্চিমবঙ্গে 'নারী মুক্তি সমিতি' নামে নারী-সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি। পার্টির পুরুষ সদস্যদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ খুব প্রবল থাকার কারণেই

এই প্রচেষ্টা সফল হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া মধ্যশ্রেণি থেকে নারী কর্মী আসার প্রক্রিয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মলয়া ঘোষ লালবাজারে ৬৪ দিন থাকার পর জেল জীবনের অভিজ্ঞতায় বলেছেন- "আমি এক ভারতবর্ষের নারী সমাজের বাসিন্দা, অন্য এক ভারতবর্ষের নারী সমাজের চিত্র দেখি...।"[২১] মলয়া ঘোষকে রুনু গুহের টর্চার চেম্বারে নিয়ে এসে পুলিশ অফিসার উমাশঙ্কর লাহিড়ীর নির্দেশ হল- "এ যদি আগামীকালের মধ্যে এই মহিলার খবর না বলে, তাহলে কালকেই 'এর' অর্ধেক মাথা কামিয়ে চুন মাখিয়ে লালবাজার চত্বরে ঘোরানো হবে।"[২২] সেই সময় মেয়েদের উপর অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। পুরুষশাসিত সমাজে জেলখানার বাইরে যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছে এই বন্দিরা, তারা জেলখানার ভেতরে তার চেয়েও নির্মম যন্ত্রণা পাবে- এ তো জানা কথা। জেলের ভেতর বন্দিরা যখন অনশন করছেন তখন কর্তৃপক্ষ অনশন ভাঙার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। কর্তৃপক্ষ "নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অনশনকারী মহিলাদের কমরেডদের চুলের মুঠি ধরে মেঝেতে পেড়ে এক একটা বিহারী সেপাইকে দিয়ে ধর্ষণ করাচ্ছে।"[২৩] বাকি মহিলা তখন অনড়। লালবাজার থানা লক-আপে কুখ্যাত পুলিশ অত্যাচারে নেতৃত্ব দিত। অন্যান্য অত্যাচারের পাশাপাশি "কোনো মেয়ের চুল পুড়িয়ে পুড়িয়ে চামড়া পোড়ানো পর্যন্ত জ্বলন্ত চুরুটের ছ্যাকা দিয়েই যেত। কাউকে জ্বলন্ত চুরুট দিয়ে সারা কপাল-গালে 'চন্দন' পরিয়ে দিত।"[২৪]

বামপন্থী পার্টিতেও পুরুষতান্ত্রিকতা বেশ ভালোভাবেই ছিল। "কয়েকটি শেল্টার-এ বেশ কিছু পুরুষ অশালীন আচরণ করছে তা-ও মুখ বুজে থাকতে হয় শেল্টার হারানোর ভয়ে।"[২৫] এ কথা তৎকালীন পার্টির নেতৃত্বকে জানালে সমালোচনা শুনতে হয়েছে যে নিজেদের ভুলেই এরকমটা হচ্ছে। আবার "বাড়ির সবাই সমর্থক এমন রাজনৈতিক মানুষজন এমনকী শ্রমিক বাড়িতেও

'মলেস্টেশন'-এর শিকার হতে হয়।"[২৬]নেতৃত্বকে জানালে শুনতে হয় যে শ্রমিক এটা করতে পারেনা। কিন্তু শ্রমিক-কৃষকও যে মানুষ সেটা কী করে বোঝানো সম্ভব! মানুষের দোষ-গুণ তাই তাদের মধ্যেও থাকে। তা না হলে শ্রমিক-কৃষক তাদের বাড়ির বউদের উপর অত্যাচার করে কেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে নেতৃত্বের কাছ থেকে জবাব এসেছে "রাজনীতিকে আঁকড়ে ধর, তাহলে নিজের কোথায় সমস্যা হচ্ছে বুঝতে পারবে।"[২৭] তাই মেয়েদের ওপর যে পাহাড় বসে আছে তার উচ্ছেদ নারী-পুরুষ উভয়ে মিলে করতে হবে। পুরুষদেরও পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। পরিবারতন্ত্র, পিতৃতন্ত্রের নির্দয় দাঁত নখ ছিন্নভিন্ন করে দেয় এসব মেয়েদের জীবনকে। কোনো অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত না হয়েও তারা জেলে বন্দি থাকে। এমনকি কোনো অপরাধ করার দায়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয়নি, বরং সে-ই স্বয়ং অভিযোগকারিণী, তবু সে-ই জেলে বন্দি থাকে। এই ব্যবস্থায় ধর্ষকরা মুক্ত থাকে আর ধর্ষিতারা থাকে জেলে।

জেলখানায় ছিল সমকামিতার অবাধ বিস্তার। বাঁধভাঙ্গা বন্যার জলের মতোই তা ঘোলা করে তোলে ওয়ার্ডের পরিবেশ। এইভাবে জেলখানা ধীরে ধীরে ব্যাধিগ্রস্থ ও বিকৃত করে তুলত বন্দিদের। পাশাপাশি জেলের মধ্যে বন্দিদের নানা উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। যারা রাজনীতিতে সৃষ্টিশীলতার জন্য জেলখানায় বন্দি, তাদের সৃজনশীল প্রতিভা, উদ্ভাবনী দক্ষতার কাছে, এমন সব নিয়মকানুন, তাদের প্রয়োজনে, বাধা হয়ে থাকতে পারে নি। মাথা খাটিয়ে কিছু না কিছু বের করে, তারা বাধা উতরে গিয়েছেন। জেলখানায় দেওয়া অ্যালুমিনিয়াম থালা ঠুকে ঠুকে চা বানানোর কড়াই তৈরি করা। সকালের জলখাবারের চিঁড়ে কড়াইয়ে শুকনো ভাজতে ভাজতে পুড়িয়ে কিছুটা কালো করে নিয়ে দুধ আর চিনি দিয়ে কফি বানিয়ে ফেলা। সেফটিপিন দিয়ে লেবু কাটা, গারদের গায়ে ঠিক কায়দা মতো ঠুকে ডাবের ঢাকনি খুলে ফেলা, ঢ্যাঁড়স চিবিয়ে বা চিবোতে না পেরে তার ছিবড়ে শুকিয়ে জ্বালানি করা ইত্যাদি। জেলে ব্যবহৃত থালা-গ্লাসগুলো দমদম জেলে বন্দিরা তৈরি করেন। বন্দি ব্যবহারকারীদের কাছে থালাগুলো স্পষ্ট জীবন্ত চরিত্র

আছে। যেসব থালা কোনো সময়ে সাঁওতাল বন্দিদের কাছে ছিল, সেগুলোর গায়ে অদ্ভুত সুন্দর নকশা কাটা। একটা পেরেক বা এক টুকরো ভাঙ্গা লোহার পাত দিয়ে সন্তর্পণে ঠুকে ঠুকে তৈরি। এই নকশা মানুষের সৌন্দর্য সৃষ্টির সেই অপরাজেয় রহস্যময় আবেগকে প্রকাশ করেছে। জেলের অমানবিকতা, অপরিচ্ছন্নতা, কুৎসিত প্রতিপার্শ্বের মাঝখানে হঠাৎ সৃষ্টিশীলতার, জীবনমুখীতার এই মানবিক চিহ্ন যেন এক অদ্ভূত বার্তা নিয়ে আসে।

সবশেষে বলা যায় জেল স্মৃতিগুলি প্রত্যেকটি স্বমহিমায় উজ্জ্বল। জেলস্মৃতিগুলির ঐতিহাসিক মূল্যের পাশাপাশি সৌন্দর্যমূল্য নিছক কম নয়। সুতরাং জেলস্মৃতিগুলি আমাদের কাছে চিরস্থায়ী সৌন্দর্যের আলোকবর্তিকা হিসেবে দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি পুরুষতন্ত্রের ছায়ায় মেয়েদের নিজেদের পরিচয়কে হারিয়ে ফেলার প্রক্রিয়ায় শামিল করা হয়েছিল অগোচরে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেওয়া ছাড়াও, যাঁরা নকশালদের আশ্রয় দিতেন নিজেদের পরিবারে, নিজেদের পরিবারের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন সাবলীলভাবে, পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেন, তাঁদের অবদান আন্দোলনে কোনো অংশে কম নয়। আন্দোলনকর্মীদের আত্মত্যাগ, আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে জেলস্মৃতিগুলি একটা সময়কে চিহ্নিত করেছে এবং পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় জেলস্মৃতিগুলি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় জ্বলজ্বল করছে।

তথ্যসূত্র :

১. উদ্ধৃতিটি আজিজুল হকের ০৯/০৪/২০১৯ তারিখে নেওয়া সাক্ষাৎকারের একটি অংশ।

২. *গাঙচিল পত্রিকা,* 'নকশাল', কলকাতা, বইমেলা ২০১৮, তৃতীয় সংখ্যা, অধীর বিশ্বাস (সম্পাদক), পৃষ্ঠা. ১৪৯

৩. জয়ী পাল (সম্পা.), *নকশালবাড়ি মেয়েদের বয়ানে*, কলকাতা, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা. ১১

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২

৫. *গাঙচিল পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৭

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৬

৭. পূর্বোক্ত

৮. পূর্বোক্ত

৯. জয়ী পাল (সম্পা.), *নকশালবাড়ি মেয়েদের বয়ানে*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১১৯

১০. মধুময় পাল (সম্পা.), *নকশালবাড়ি বজ্রনির্ঘোষের আগুনগাথা* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৭, পৃষ্ঠা. ১২৮

১১. শৈলেন মিশ্র, *নকশাল আন্দোলন মানুষের ভূমিকা*, কলকাতা, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৫২

১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৩-৫৪

১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৪

১৪. পূর্বোক্ত

১৫. *গাঙচিল পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩৩

১৬. শৈলেন মিশ্র, *জ্যোৎস্না রাতের সত্তর দশক*, কলকাতা, গাঙচিল, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা. ৯৫

১৭. শঙ্খ ঘোষ, *কবিতার মুহূর্ত,* কলকাতা, অনুষ্টুপ, ষষ্ঠ মুদ্রণ : মাঘ ১৪১৪, পৃষ্ঠা. ৫২

১৮. আজিজুল হক, *কারাগারে ১৮ বছর* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৬, পৃষ্ঠা. ১৩১

১৯. মধুময় পাল (সম্পা.), *নকশালবাড়ি বজ্রনির্ঘোষের আগুনগাথা* (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৯৬

২০. সন্তোষ রাণা, *রাজনীতির এক জীবন,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা. ২২১

২১. মলয়া ঘোষ, *লালবাজারে ৬৪ দিন,* কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা. ২৮

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩

২৩. আজিজুল হক, *কারাগারে ১৮ বছর* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৫

২৪. কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *নকশাল আন্দোলনে মেয়েরা,* কলকাতা, পিপলস্ বুক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা. ১৪

২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৭

২৬. পূর্বোক্ত

২৭. পূর্বোক্ত

উপসংহার

সভ্যতার শুরু থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানব সমাজের যে ধারাবাহিকতা তারই অনিবার্য অন্যতম ফসল হল সাহিত্য। জীবন ও জগতের যে কোন মূর্ত বা বিমূর্ত বিষয় সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। ফলে মানুষ তার কল্পনা-প্রতিভা হৃদয়চারিতা, মননক্রিয়া ও মনস্বিতা জীবনের যেকোনো অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি এবং অনুভবকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করতে পারে। জেলসাহিত্যের উপাদান হল জেলজগৎ, জেলের শাসকবর্গ, কয়েদিজগৎ এবং কয়দিমন। এইসব উপাদানগুলি সাহিত্যে কীভাবে পরিবেশিত হবে তা লেখকের শিল্পদক্ষতার উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলের রূপরেখার বিভিন্নতা বন্দিদের একই অভিজ্ঞতায় আচ্ছন্ন করে না। তাই জেল স্মৃতিগুলিতে তাঁদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সাপেক্ষে পরিবেশিত হয়েছে। জেলব্যবস্থার দিক থেকে জেলস্মৃতি নতুনতর অধ্যায় হয়ে উঠেছে। আত্মত্যাগ ও আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে স্মৃতিকথাগুলিতে তাঁরা এক ধরনের সাত্ত্বিক স্তরে নিজেদেরকে উন্নীত করেছেন। একদিকে স্মৃতিকথাগুলির ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ, অপরদিকে তার সাহিত্যিক মূল্যও অনস্বীকার্য। প্রতিটি গ্রন্থে এমন কিছু আদর্শবাদী ব্যক্তির আত্মকাহিনি প্রতিফলিত হয়েছে যারা সেই সময়ের নানান সংগ্রাম ও ঘটনার মধ্যে দিয়ে সেই সময়কে, নিজেকে এবং নিজেদের যাপিত অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন। ফলে আত্মকাহিনিগুলিতে তাঁদের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপের সহজ পরিচয় পাওয়া গেছে। জেলস্মৃতিগুলিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চিত্রের পাশাপাশি সেই অভিজ্ঞতা প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য জেলস্মৃতিগুলির ঐতিহাসিক পটভূমি সত্তরের নকশাল আন্দোলন। এজন্য এই সময়কালে জেলস্মৃতি মুখ্য ধারাটি রাজনৈতিক। কৃষক অভ্যুত্থান থেকে শুরু হওয়া নকশালবাড়ি আন্দোলন অসংখ্য যুবক-যুবতীর সমাজ বদলের স্বপ্নে পরিণতি পেয়েছে। স্থানীয় শোষক জমিদার ও অত্যাচারী পুলিশি ব্যবস্থায় কৃষক অভ্যুত্থানের নানা কর্মপদ্ধতি, নকশালবাড়ি আন্দোলনের

বিভিন্ন পর্যায়ে রাষ্ট্রের দমনমূলক আইন শেষ পর্যন্ত আদর্শবাদী নকশালকর্মীকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলখানায় বন্দি করেছিল। এই সমস্ত আন্দোলনকর্মীদের জেলজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সাহিত্য রচনার পথে আত্মনিয়োজিত করেছে। এরই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া বাংলা সাহিত্যে জেলস্মৃতি নামক একটা ঐতিহাসিক ধারার সংযোজন। অর্থাৎ বিশেষ একটি রাজনৈতিক কারণে যাঁরা জেলের ভেতর বন্দি হয়েছিলেন তাদের অভিজ্ঞতার ফসল বর্তমান জেলস্মৃতিগুলো। কংগ্রেসি জেলব্যবস্থার নানা উৎকেন্দ্রিক দিক, অবরুদ্ধ বন্দিমন, জেলজীবনের নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব বন্দিমনে একটি বিকল্প আত্মপ্রকাশ চাহিদা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং বলা যায় সাতের দশকের জেলব্যবস্থার স্থায়ী ফসল বর্তমান জেলস্মৃতিসমূহ।

এই সাহিত্য-চিহ্নিত গদ্য রচনার বিষয়কেন্দ্র হল সাতের দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলেব্যবস্থা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী, প্রখর রাজনৈতিক চেতনা এবং অবর্ণনীয় অমানবিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতা তাঁদের বিচলিত করেছে। সুতরাং গ্রন্থগুলি ব্যক্তিজীবনের একটি বিশেষ সময়কালের জেলঅভিজ্ঞতার স্মৃতিচিত্রণ। আত্মজীবনীধর্মী জেলস্মৃতিতে লেখকের রাজনৈতিক এবং জেলজীবনের অভিজ্ঞতায় প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং আত্মজীবনীধর্মী জেলস্মৃতি লেখকের জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ের বিবরণ।

বেদনাসিক্ত স্মৃতি লেখক সম্প্রদায়কে ঘিরে এমন ভাবে আলোড়িত করেছে যে যাঁরা আত্মত্যাগে, আত্মনিগ্রহে কেবল মহান নন, মৃত্যুর আঙিনায় এসেও তাঁরা আরও দৃঢ় হয়েছেন। তাঁদের কাছে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, স্বচ্ছলতা- জীবনের এই জরুরী দিকগুলি মূল্যহীন ছিল। এজন্য যেকোন দেশে ও কালে বিপ্লব আন্দোলনে এবং বিপ্লবী প্রেরণার ক্ষেত্রে স্মৃতিকথাগুলি স্থায়ী উপাদান হিসেবে ভাস্বর হয়ে থাকবে। পৃথিবীতে যতদিন কারাগার এবং দন্ডব্যবস্থা বর্তমান থাকবে ততদিনই কারাগারের অভ্যন্তরে মানুষগুলিকে কেন্দ্র করে তাদের নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, ইন্দ্রিয়

পীড়ন এবং বিভীষিকাময় মানবিক অবস্থা সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠবে। বর্তমান লেখকরা সেই উপাদানকে কেবল গ্রহণ করেননি, আত্মসাৎ করেছেন। পৈশাচিক পীড়ন ও অমানসিক দৈহিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তাঁরা সৃষ্টি করেছেন স্মৃতিকথাগুলিকে।

সাতের দশকে বিভিন্ন জেলখানায় নকশাল বন্দিদের জেলস্মৃতির তুলনা কেবলমাত্র বিশেষ একটি রাজনৈতিক যুগের চরিত্র জানার পক্ষেই জরুরি নয়, বন্দিদের রাজনৈতিক-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, উপস্থাপনার পার্থক্য, বিষয় নির্বাচনের পার্থক্য ইত্যাদির জন্য জরুরি। জেলজগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এক একজন লেখক এক এক ভাবে দেখেছেন। জেলের সাধারণ বন্দি, সাধারণ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তাদের অত্যাচার, জেলের প্রচলিত দন্ড ব্যবস্থা এবং সহবাসী বন্দির প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই বিভিন্ন। কারো কাছে বন্দিমন বেশি সক্রিয়, কারো বা জেলজগৎ। অনেকে জেলজগতের সত্য অপেক্ষা অভিজ্ঞতা ও অনুভবের সত্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার এমন অনেক লেখক আছেন যাঁরা বন্দিদশার অভিজ্ঞতাকে জেলজীবনে সীমাবদ্ধ রাখেননি। কেউ বা বন্দিজীবনের ভেতরেই নারী, প্রেম, সমকামিতা, যৌন কামনার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, শিল্পচেতনা, শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ ও অপকর্ষবোধ, জীবন বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য প্রভৃতি স্মৃতিকথায় বিভিন্ন আকারে পরিবেশিত হয়েছে।

জেলব্যবস্থা সুস্থ মানুষের দেহে নৈরাশ্যের ব্যাধি প্রবেশ করাতে পারে, জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন অভিমুখী করে তোলে, আবার অন্যের জীবন সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। এই কলুষিত জেল আবহাওয়া তাদের অবশিষ্ট মনুষ্যত্বের বিকৃতি ঘটিয়ে দেয়। পাগলবাড়ির বাস্তব অস্তিত্ব এবং তার রহস্যময় ইতিবৃত্ত- যা শুধুমাত্র আমাদের শিহরিত করে না, যন্ত্রণা দেয় না, ক্ষুদ্ধ ও জর্জরিত করে তোলে।

রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ এক সময় ছিল প্রথা-বহির্ভূত। আন্দোলনে মহিলাদের যোগদান করার অর্থ তাঁদের মাতৃসুলভ ইমেজ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা। পুরাণে নারীদের দুই রূপে পাওয়া যায়। এক, মাতৃরূপ; দুই, শক্তিরূপ। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীরা শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। স্মৃতিকথাগুলিতে প্রতি জনের নানা কথায় উত্তাল সত্তর দশক জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি ভালবাসায় তাঁরা আন্দোলনে জড়িয়েছেন, সক্রিয় থেকেছেন নানাভাবে। সাতের দশকের সেই উত্তাল দিনগুলিতে মেয়েদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত শুধু তাঁদের গ্রেফতারির দিনগুলিতে। বিপ্লবের স্বপ্ন-দেখা সেই মেয়েদের অস্তিত্বের খবর জানা যেত শুধুমাত্র পুলিশের অত্যাচারের বাড়াবাড়িতে। পুরুষের কঠোর আড়ালে চাপা থাকত তাঁদের অস্তিত্ব।

নকশাল আন্দোলন শেষপর্যন্ত আঘাত হেনেছিল একটি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে, শোষক-শোষিতের সম্পর্ককে। এই সমগ্র সার্বিক আন্দোলন যত ব্যর্থ এবং ক্ষণস্থায়ী হোক, রাষ্ট্রীয় দমন পীড়ন তাকে যেভাবেই নিশ্চিহ্ন করুক তা সমগ্র ভারতবাসীর সামনে কয়েকটি মৌলিক সত্যকে, জীবন জিজ্ঞাসাকে, ভারত রাষ্ট্রের নঞর্থক দিককে অনাবৃত করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলেও তার জিজ্ঞাসা, ঘুরিয়ে দেওয়া জীবনের অভিমুখে, বিদ্রোহী জেহাদ রাষ্ট্রের মূল্যায়ন, কৃষি-ভারতের সঙ্গে আত্মীয়তা আর ত্যাগের শৌর্যের অপরাজিত গভীর দহন বাঙালির, মননশীল মানুষের মনে চিরস্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়ে গেছে।

নকশাল আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে ও অভিজ্ঞতায় লেখা জেলস্মৃতিগুলো বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। স্মৃতিকথাগুলোর মধ্যে লেখকসত্তা ও কর্মীসত্তা কোথাও গিয়ে এক হয়ে যায়। ফলে জীবন ও রাজনীতির এক মন্ত্রে অন্বিত হয়ে শিল্পের যে স্বতস্ফূর্ততার শিখা, জীবন অন্বেষায় তা সাহিত্য হয়ে ওঠে— এই পর্যায়ের স্মৃতিকথাগুলো তার নিদর্শন।

নকশাল আন্দোলনের এই বন্দিদের লেখাগুলো সবই ব্যক্তিগত লেখা । কিন্ত সেই ব্যক্তিগত লেখাগুলো কোথাও ব্যক্তির সীমাকে ছাড়িয়ে গিয়ে প্রায় সকলের লেখা হয়ে উঠেছে। রাজনীতিক কর্মীদের যুগবিপ্লবের ইতিহাস তাঁদের জীবনের সঙ্গে এতখানিই বিজড়িত ছিল যে, আত্মকাহিনি রচনা করে তাঁরা নিজেদেরও সেই যুগকে আঁকতে চেয়েছিলেন। আত্মকাহিনিগুলো আত্মকুণ্ডয়ন নয়। আত্মকাহিনিগুলোতে শুধু জেলের চিত্রই নয়, ফুটে উঠেছে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সরকারের একনায়কোচিত মনোভাব ও অত্যাচার-নির্যাতনের নানা চিত্র। ফলে একজন বন্দির আকুতি, মানুষের জন্য ভাবনা ও রাজনৈতিক দর্শনও ফুটে উঠেছে। এই লেখাগুলোতে ব্যক্তি অভিজ্ঞতার মধ্যে সমষ্টির অভিজ্ঞতা কোথাও মিশে যাচ্ছে। ফলে অনেকসময় একজনের লেখা থেকে অন্যজনের লেখার খুব বেশি তফাৎ থাকছে না। সুতরাং জেলস্মৃতিগুলোতে তাঁদের উপর অত্যাচারের ইতিহাস,তাদের কষ্ট পাওয়ার ইতিহাস— এটাই শুধু নয়, একই সঙ্গে একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার যে নির্লজ্জতা, তারও ইতিহাস।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি

স্মৃতিকথন

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

১. অজিত চক্রবর্তী, *জেলের গারদে জীবনের গান,* কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ- ফেব্রুয়ারি ২০১৬

২. আজিজুল হক, *কারাগারে ১৮ বছর,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ২০০৬

৩. জয়া মিত্র, *হন্যমান,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ- জুন ২০১৬

৪. মলয়া ঘোষ, *লালবাজারে ৬৪ দিন,* কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ- ফেব্রুয়ারি ২০১১

৫. মীনাক্ষী সেন, *জেলের ভেতর জেল (পাগলবাড়ি পর্ব),* কলকাতা, পিপলস বুক সোসাইটি, প্রথম পি.বি.এস.প্রকাশ- বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৩

৬. সন্তোষ রাণা, *রাজনীতির এক জীবন,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ- আগস্ট ২০১৮

সহায়কগ্রন্থ

১. অনিল আচার্য (সম্পাদিত) *সত্তর দশক (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা, অনুষ্টুপ, পরিমার্জিতও পরিবর্ধিত অনুষ্টুপ সংস্করণ- জুন ২০১৪

২. অনিল আচার্য, (সম্পাদিত), *সত্তর দশক (দ্বিতীয় খণ্ড)*, কলকাতা, অনুষ্টুপ, তৃতীয় মুদ্রণ- নভেম্বের ২০১৪

৩. অমর ভট্টাচার্য, *লাল তমসুক*, 'নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য – সংকলন', কলকাতা, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ- মার্চ ২০১৪

৪. অমিত ভট্টাচার্য, *কারাস্মৃতি সত্তরের মশাল*, কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০১৪

৫. অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, কলকাতা, এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ- বইমেলা ১৯৯৯

৬. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর*, কলকাতা, পার্ল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৯৭

৭. অর্জুন গোস্বামী, (সংকলন ও সম্পাদনা), *নকশালবাড়ির দিনগুলো*, কলকাতা, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০১৭

৮. অশোক চট্টোপাধ্যায়, *সরোজ দত্ত সমর সেন এ ব্রতযাত্রায়,* কলকাতা, ঠিকঠিকানা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত প্রথম ঠিক ঠিকানা সংস্করণ- জানুয়ারি ২০১৯

৯. আজিজুল হক, *জেলখানার নোটবই*, কলকাতা, আর.বি.এন্টারপ্রাইজেস, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১৬

১০. আজিজুল হক, *জেল ডায়েরী*, কলকাতা, ছাড়পত্র, আজকাল ২১, ২২, ২৩/৭/১৯৮৬

১১. আজিজুল হক, *নকশালবাড়ি : তিরিশ বছর আগে এবং পরে,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- কলিকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৯

১২. আদিত্য চৌধুরী, *বাংলা কারাসাহিত্য,* কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ- ৫ সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবস, ১৯৯১

১৩. উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *নির্বাসিতের আত্মকথা,* কলকাতা, পারুল, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ- ২০১৮

১৪. কুমার দীপংকর মণ্ডল, *নকশাল আলোয় পাঁচ উপন্যাস,* ঢাকা, ভাষাচিত্র, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০১৭

১৫. কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *নকশাল আন্দোলনে মেয়েরা,* কলকাতা, পিপলস বুক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭

১৬. খোকন মজুমদার, *ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ,* শিলিগুড়ি, প্রথম প্রকাশ- ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪

১৭. জয়ী পাল (সম্পা.), *নকশালবাড়ি মেয়েদের বয়ান,* কলকাতা, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০১৮

১৮. তরুন গঙ্গোপাধ্যায়, *নকশাল নকশাল বিপ্লবের প্রথম দশক,* কলকাতা, ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল, প্রথম প্রকাশ- ১২ অক্টোবর ১৯৭৭

১৯. তরুন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *নকশালবাদী রাজনীতির বিভিন্ন ধারা,* কলকাতা, প্রত্যয়, প্রথম সংস্করণ- জুলাই ১৯৭৮

২০. নির্মল ঘোষ, *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য,* কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ- ১লা মাঘ ১৪০১

২১. নীলাঞ্জনা দত্ত (সম্পা.), *পাঁচ প্রজন্মের নকশালবাড়ি,* কলকাতা, পূর্বালোক পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০১৮

২২. পুলকেশ মন্ডল, জয়া মিত্র, (সম্পা.), *সেই দশক,* 'নকশালপন্থী আন্দোলন : ফিরে দেখা', কলকাতা, প্যাপিরাস, প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৯৯

২৩. প্রদীপ বসু (সম্পা.), *মননে সৃজনে নকশালবাড়ি,* কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ- আগস্ট ২০১২

২৪. প্রদীপ বসু, *নকশালবাড়ি পূর্বক্ষণ কিছু পোস্ট মডার্ন ভাবনা,* কলকাতা, পোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ১৯৯৮

২৫. প্রমোদ সেনগুপ্ত, *বিপ্লব কোন পথে? (মার্কসবাদ না সন্ত্রাসবাদ),* কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- ১ মে ১৯৭০

২৬. ফটিকচাঁদ ঘোষ, *নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য,* কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ২০১২

২৭. বরুণ সেনগুপ্ত, *পালাবদলের পালা,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ১৯৭১

২৮. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), *নকশাল আন্দোলনের গল্প,* কলকাতা, পুনশ্চ, তৃতীয় সংস্করণ- সেপ্টেম্বর ২০১২

২৯. ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী, *সাতচল্লিশ থেকে সত্তর এবং আগে পরে*, কলকাতা, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ- বইমেলা ২০১১

৩০. মধুময় পাল (সম্পা.), *নকশালবাড়ি বজ্রনির্ঘোষের আগুনগাথা,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ- জুলাই ২০১৭

৩১. মধুময় পাল (সম্পা.), *নকশালবাড়ি বজ্রনির্ঘোষের আগুনগাথা,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, দ্বীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ- জুলাই ২০১৭

৩২. রথীন চট্টোপাধ্যায়, *সংশপ্তক*, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭

৩৩. শঙ্খ ঘোষ, *কবিতার মুহূর্ত*, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ষষ্ঠ মুদ্রণ- মাঘ ১৪১৪

৩৪. শৈলেন মিত্র, *জ্যোৎস্না রাতে সত্তর দশক,* কলকাতা, গাঙচিল, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৫

৩৫. শৈলেন মিশ্র, *নকশাল আন্দোলন মানুষের ভূমিকা*, কলকাতা, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০১৭

৩৬. শুভলক্ষ্মী পান্ডে, *ষাট-সত্তরে নদীয়া : নকশালবাড়ির নির্মাণ*, কলকাতা, রিডার্স সার্ভিস, প্রথম প্রকাশ– ২৬ জানুয়ারি, ২০০৪

৩৭. শুভেন্দু দাশগুপ্ত (সম্পা.), *জেলখানায় লেখা সত্তর*, কলকাতা, ঠিকঠিকানা, দ্বিতীয় পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ- ২০১৭

৩৮. শ্রীঅরবিন্দ, *কারাকাহিনী*, কলকাতা, পত্রলেখা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৬

৩৯. সুনীতিকুমার ঘোষ, *নকশালবাড়ি একটি মূল্যায়ন,* কলকাতা, পিপলস বুক সোসাইটি, দ্বিতীয় মুদ্রণ- জুলাই ২০১৫

৪০. সুমনকল্যাণ মৌলিক (ভাষান্তর), *নকশালবাড়ি থেকে লালগড় এক বহুমাত্রিক ক্রিটিক,* কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি

৪১. সৌরেন বসু, *চারু মজুমদারের কথা,* কলকাতা, পিপলস্ বুক সোসাইটি, তৃতীয় মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০১৭

৪২. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *রাজনীতির অভিধান,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৬

ইংরেজি সহায়কগ্রন্থ

১. Amit Bhattacharyya, *The 'Spring Thunder' and Kolkata – an epic story of courage and sacrifice 1965-72*, Kolkata, Setu Prakashoni, First Edition- January 2018

২. Sumanta Banerjee, *In The Wake of Naxalbari*, Kolkata, Sahitya Samsad, Second Edition- December 2009

পত্র-পত্রিকা

১. *অনীক*, 'নকশালবাড়ি পঁচিশ বছর', কলকাতা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯২, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৩-৪, দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও রতন খাসনবিশ (সম্পা.)

২. *অনীক*, ‘নকশালবাড়ি ৫০ বছর’, কলকাতা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৭, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৭-৮, দীপঙ্কর চক্রবর্তী (সম্পা.)

৩. *অনীক*, ‘আবার নকশালবাড়ি’, কলকাতা, মে ২০১৭, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ১১, দীপঙ্কর চক্রবর্তী (সম্পা.)

৪. *অনীক*, কলকাতা, জুলাই ২০১৭, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ১, দীপঙ্কর চক্রবর্তী (সম্পা.)

৫. *অনীক*, কলকাতা, জুন ২০১৮, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ১২, দীপঙ্কর চক্রবর্তী (সম্পা.)

৬. *এবং অন্যকথা*, ‘নকশাল আন্দোলনের ৫০ বছর’, উত্তর চব্বিশ পরগণা, জানুয়ারি ২০১৭, vol- 13, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও জলধর হালদার (সম্পা.)

৭. *এবং জলার্ক*, ‘চারু মজুমদার সংখ্যা ৮’, কলকাতা, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০১৩, ষোড়শ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, স্বপন দাসাধিকারী (সম্পা.)

৮. *কৃত্তিবাস*, ‘নকশাল আন্দোলনের ৫০ বছর (বিশেষ ক্রোড়পত্র)’, কলকাতা, এপ্রিল-জুন ২০১৭, বর্ষ ২, সংখ্যা ৩ (২৫ বৈশাখ সংখ্যা), বীজেশ সাহা (সম্পা.)

৯. *গাঙচিল পত্রিকা*, ‘নকশাল’ কলকাতা, বইমেলা ২০১৮, সংখ্যা ৩, অধীর বিশ্বাস (সম্পা.)

১০. *চর্চা*, ‘নকশালবাড়ি : বিস্মরণের বিপরীতে (ক্রোড়পত্র)’, তৃতীয় পরিসর প্রকাশনা, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৭, অসীমকুমার হালদার (সম্পা.)

১১. *চেতনা*, ‘স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের গণ আন্দোলনের ইতিহাস’, বারাসাত, ১জানুয়ারি ২০০০, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১

১২. *দেশ*, 'নকশালবাড়ি ৫০', কলকাতা, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪, বর্ষ ৮৪, সংখ্যা ১, সুমন সেনগুপ্ত (সম্পা.)

১৩. *দেশকাল ভাবনা*, 'নকশালবাড়ি ৫০ বছর', কলকাতা, ৫ জুন ২০১৭, বর্ষ ৮, সংখ্যা ২১, রতন খাসনবিশ, (সম্পা.)

১৪. *নিরন্তর*, 'নকশাল আন্দোলন ফিরে দেখা', কলকাতা, মে ২০১৮, বর্ষ ৮৫, সংখ্যা ২, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)

১৫. *পদক্ষেপ*, 'সত্তরের সেই দিনগুলি', কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, বর্ষ ৪৪, সংখ্যা ৪৮, অভিজিৎ মিত্র (সম্পা.)

১৬. *প্রতিবাদী চেতনা*, 'নকশালবাড়ি আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর', শান্তিপুর (নদীয়া), ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭, বর্ষ ৩৮, সংখ্যা ২৪, বিপ্লব দাশগুপ্ত (সম্পা.)

১৭. বিতর্কিকা, 'প্রসঙ্গ : কারা-সাহিত্য', কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, নবপর্যায়, আগস্ট ২০১৬, বর্ষ ৪

১৮. *মুখাবয়ব*, 'মীনাক্ষী সেন জীবন কথা আর সৃষ্টি', আগরতলা ও কলকাতা থেকে একযোগে প্রকাশিত, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪২১, বর্ষ ৩১, সংখ্যা ১, দেবব্রত দেব (সম্পা.)

১৯. *লোকায়ন*, 'নকশালবাড়ি বিশেষ সঙ্কলন', কলকাতা, মার্চ ১৯৬৮, চতুর্থ সংকলন, শৈলেন চৌধুরী (সম্পা.)

২০. *Newsletter*, School of Women Studies, Jadavpur University, Kolkata, September 2018, Vol-35

স্মৃতিকথন : কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৭৪ সালের মার্চ-এপ্রিল নাগাদ আমি প্রথম জেলে গিয়েছিলাম। আমি তিনটি জেলে ছিলাম- প্রেসিডেন্সি জেল, হুগলি জেল ও বর্ধমান জেল। প্রেসিডেন্সি জেলে আমারা একটা ঘরে শুধু নকশার মেয়েরা থাকতাম। যেটা একসময় 'ডিভিশন ওয়ার্ড' ছিল। কিন্তু পরে আমাদের সময়ে সেটা 'নকশাল' ওয়ার্ডে পরিণত হল। নকশাল ওয়ার্ডের লাগোয়া মেয়াদি নম্বরের একটা ঘর ছিল। কিন্তু মেয়াদিতে কোনো মেয়াদি অর্থাৎ কোনো সাজাপ্রাপ্ত বন্দি থাকত না। সেখানে পাকিস্তানি যুদ্ধ বন্দিরা থাকত। পাকিস্তান-বাংলাদেশের যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে পাকিস্তানী সেনাদের স্ত্রী, মেয়ে, বাচ্চারা থাকত। প্রথম দিনে জেলে এসে প্রত্যেককে সাধারণ বন্দির সঙ্গে থাকতে হত। নকশাল মেয়েদের নকশাল ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হত। চাতাল লাগোয়া একটা দোতালা বাড়ি ছিল- যেটার নীচে ছিল পাগলবাড়ি (পাগলবাড়ি নিয়ে মীনাক্ষী সেনের একটা বই আছে, *জেলের ভেতর জেল* পাগলবাড়ি পর্ব) আর উপরে ছিল মেয়েদের সেল। পাগলবাড়িতে কত পাগলকে যে একসঙ্গে বেঁধে রাখা হত, তার কোন হিসেব ছিল না। এই পাগলবাড়িতে সত্যিকারের বেশির ভাগই পাগল ছিল না। তবে জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে যারা পাগল হয়ে ছিল তারাই সেখানে থাকত। সাধারণত নকশাল বন্দিদের অন্য কোন বন্দিদের সঙ্গে কথা বলার কথা বলার নিয়ম ছিল না। যদি কোনো সাধারন বন্দি নকশাল বন্দিদের সঙ্গে কথা বলত বা কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত তখন তাদের উপর চলত মেটদের অত্যাচার এবং অনেক সময় জেল কর্তৃপক্ষ সাধারণ বন্দিদের 'ডিগ্রী'-তে দিয়ে দিত। 'ডিগ্রী' হল জেলের পাগলবাড়ি। এই পাগলবাড়িতে বন্দিদের ছুঁড়ে খাবার দেওয়া হত, চুল টেনে কথা বলা হত। ফলে সুস্থ বন্দিরা জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারে পাগলবাড়িতে থাকত, তারা এই সব দেখে ধীরে ধীরে অসংলগ্ন কথা বলত। তখন তারা 'পাগল' বলে বিবেচিত হয়ে যেত। পাগলবাড়িতে রোজ কেউ না কেউ মারা যেত আর আমরা রোজ রোজ সেখান থেকে একটা করে মৃতদেহ বেরিয়ে আসতে দেখতাম।

আমি যখন হুগলি জেলে ছিলাম তখন গ্রাম থেকে একটি মেয়ে জেলে আসে। মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল, তাই শ্বশুরবাড়ির লোকজন থাকে পাগল সাজিয়ে হুগলী জেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। হুগলী জেলে মধ্যে মেয়েদের নিয়ে আমি অনেক কাজ করেছি- গান, নাটক ইত্যাদি। আমরা জেলের মধ্যে একটা গান করতাম- 'চলেছে কৃষকের গণফৌজ...।' এরপর থেকে আমার নাম হয়ে গেল ফৌজিদিদি। গ্রাম থেকে আসা ওই মেয়েটির সঙ্গে আমাদের ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল-তাই যখন কোনো কিছু বিষয়ে আলোচনা করতাম তখন সে খুব মনোযোগ দিয়ে সেগুলো শুনত। তবে মেয়েটির অসম্ভব রকম জানার আগ্রহ ছিল। কিছুদিন পর মেয়েটিকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন প্রেসিডেন্সিতে আমাদের কমরেডরা ছিল। মীনাক্ষী একবার চিঠি লিখে জানালো যে হুগলী জেল থেকে একটি মেয়ে এসে ফৌজিদিদির কথা বলেছে। এই ফৌজিদিদি তুই তো? পরে আমি মীনাক্ষীকে লিখে পাঠালাম যে আমিই ফৌজিদিদি আর ওই মেয়েটিকে ওখানে একটু দেখিস। আমাদের নকশাল ওয়ার্ডটা বাকি ওয়ার্ডগুলোর থেকে পরিকাঠামোগত ভাবে আলাদা ছিল। যেকারণে সাধারণ বন্দিদের সঙ্গে আমাদের কথা বলার কোনো সুযোগ ছিল না। তাতে মেয়াদি নম্বরের গরাদ দিয়ে আমরা সাধারণ বন্দিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম।

নকশাল ওয়ার্ডের পাশেই ছিল ভাটিখানা। 'ভাটিখানা' হল জেলের রান্নাঘর। এখানে সপ্তাহে সপ্তাহে জামা-কাপড় কাচার ব্যবস্থা করা ছিল। এই ভাটিখানার পাশ দিয়ে আমাদের বেরোনোর রাস্তা ছিল। জেলখানায় বরাদ্দ খাবার মেট্রন, ওয়ার্ডার, মেট-রা নিয়ে চলে যেত। বন্দিদের জন্য বরাদ্দ খাবার বন্দিরা ঠিকঠাক পেত না। এমনকি পাগলদের জন্য বরাদ্দ খাবারও তারা নিয়ে চলে যেত। জেলে বন্দিদের জন্য প্রচুর খাবার আসত কিন্তু তার বেশিরভাগ অংশটা আত্মসাৎ করত জেলকর্তৃপক্ষ। জেলে 'লুনাটিক' অর্থাৎ পাগলদের জন্য এবং অসুস্থ বন্দিদের জন্য ডায়েটে ভালো খাবার বরাদ্দ করা ছিল। বিকালে ডিম, বাটার, পাউরুটি, দুধ ইত্যাদি পেত। কিন্তু এই সমস্ত

খাবার প্রথমে মেট্রন, ছোট মেট্রন, ওয়ার্ডাররা নিয়ে চলে যেত এবং অবশিষ্ট কিছু পরিমাণ পেত জেলের মেটরা। সাধারণ বন্দিদের যা খাবার দেওয়া হত, তা বোধ হয় শুধু জেলের জন্য আলাদা করে তৈরি করা হয়। আমাদের সময়ে সকালে পোকা ভর্তি মটর সেদ্ধ দেওয়া হত, যা প্রোটিন ভেবে আমরা খেয়ে নিতাম। আবার রাতে যে রুটি দেওয়া হত সেটা ভীষণ শক্ত ও তেতো ছিল। জেলের মধ্যে বন্দিদের জন্য আলাদা করে স্নানের জায়গা বা কোনো বাথরুম ছিল না। জেলের মধ্যে একটা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা করা থাকত, যা খুবই অপরিষ্কার। হুগলি ও বর্ধমান জেলে স্নানের জন্য চৌবাচ্চার জল নিয়ে বন্দিদের মধ্যে প্রায় দিনই মারামারি, চুলাচুলি হতে দেখা যেত। কিন্তু রাতে তাদের মধ্যে আবার বন্ধুত্ব হয়ে যেত।

যে মেয়েটি আমাকে 'ফৌজদিদি' বলে ডাকত, সে একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মীনাক্ষী আমাকে চিঠি লিখে তার অসুস্থতার খবর জানিয়েছিল। তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মেট্রনের ঘর ছিল জেলের 'হাসপাতাল'। সেখানে ছোট একটা বেড ছাড়া কিছুই প্রায় তেমন থাকত না। যখন কোনো গর্ভবতী মেয়ের ডেলিভারি হত, তখন তাকে সেই বেডে পর্যন্ত শুতে দেওয়া হত না। আবার আনেক বন্দি বেডে স্থান পেলেও বেডটি এত ছোট ছিল যে অনেক সময়ই সদ্যোজাত শিশু বেড থেকে পড়ে মারা যেত- যা জেলে এককথায় ভয়াবহ অত্যাচার ছিল। হুগলী জেলে করুণা মাসির বাচ্চা হয়েছিল। হুগলী জেলে বাচ্চাটি হওয়ায় সেইবারে বাচ্চাটি বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সি জেলে হলে বাচ্চা ও বাচ্চার মা কেউই বাঁচতে পারত না। এই সব অত্যাচার দেখে যখন আমরা প্রতিবাদ করতাম তখন হেড জমাদার এসে বাঁশি বাজিয়ে দিত আর আমাদের ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে পড়তে হত। বেশি কিছু বললে তখন 'পাগলি' বাজিয়ে দিত। এক্ষেত্রে সাধারণ বন্দিরা বেশি অত্যাচারিত হত। নকশাল বন্দিদের জেল কর্তৃপক্ষ ভয় পেত, সেকারণে নকশাল বন্দিদের 'ডিগ্রী'-তে দিতে পারত না। এই জেল হল অসহনীয় জায়গা। সেখান থেকে মানুষ মুক্তি পাবার জন্য পাগল হয়ে পড়ত। আমাদের একজন কমরেড একবার

খুব অসুস্থ হয়েছিল তখন ডাক্তার ভবতোষ দাশগুপ্ত দেখতে এসেছিলেন। মেয়েটির পেটে হাত দিলেই কেমন একটা কুঁচকে যেত। তারপর ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে মেয়েটি ব্যথার কথা জানায়। তখন হঠাৎ করে ডাক্তার তাকে বললেন- এই যে তুমি বাড়ি ছেড়ে, তোমার প্রিয়জন ছেড়ে, তোমার বন্ধু ছেড়ে, এখানে রয়েছ, তার থেকেও বেশি কষ্ট লাগে তোমার? এরপর মেয়েটি বিশেষ কিছু বলতে না পারায় চুপ হয়ে গিয়েছিল। এই ডাক্তারবাবু আমাদের সঙ্গে খুব গল্প করতেন। কখনো কখনো আমাদের মনে হয়েছিল যে ডাক্তার জেলকর্তৃপক্ষের লোক নয় তো? কিন্তু সেটা নাও হতে পারত। আমরা শুধু ডাক্তারকে আমাদের ও অন্যান্য বন্দিদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানাতাম। সাধারণ বন্দিদের ঋতুস্রাবের সময় অসহনীয় কষ্ট হয়েছে। হুগলী জেলে দেখেছি, পরিস্থিতির সাপেক্ষে মেয়েরা নোংরা চট, কাগজ ইত্যাদি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। তবু জেলকর্তৃপক্ষ এসব দিকে কোনো নজর দিত না। আমি এই অসহনীয় কষ্টগুলো হুগলি, বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সিত জেলে থাকার সময় দেখেছি। তখন আমি একদিন হুগলী জেলে জানিয়েছিলাম যে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে জেলার, সুপারকে জানিয়ে দেব। সে কথা শুনে ওয়ার্ডাররা বলেছে এই মেয়েদের কোনো লজ্জা নেই, সত্যি সত্যি জানিয়ে দেবে কর্তৃপক্ষকে। কিছুদিন তাদের গজ আর তুলো দিয়েছিল। আমি সেই দিয়ে ওদের প্যাড করা শিখিয়ে দিয়েছিলাম। মাস দুয়েক পরে আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল। উল্লেখ্য সেই সময় এবং বর্তমানে দাঁড়িয়েও 'পিরিয়ড' বিষয়টি মানুষের কাছে খুব লজ্জাজনক ব্যাপার।

জেলের শাসক মেট্রন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে জেলের সাধারণ বন্দিদের অত্যাচারী তৈরি করত সহবন্দিদের অত্যাচারে উদ্দেশ্যে। এই সাধারন বন্দিরা মেটদের চোখ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত। কারণ কোনো কারণে ধরা পড়ে গেলে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হত। জেল কর্তৃপক্ষ এবং মেটরা জেলের মধ্যে প্রচার করত যে নকশালবন্দিরা রক্ত খায়, ওরা মানুষ খুন করে- কিন্তু দেখতে ঠিক ওরা মানুষের মত। আসলে

ওরা মানুষরূপী রাক্ষস। এসব কথা শুনে যেসব বন্দিরা আমাদের সঙ্গে মেটদের চোখের আড়ালে কথা বলত, তারা জিজ্ঞাসা করত তোমরা তো মানুষের মত দেখতে, তোমরা তো এত ভালো, তাহলে ওরা তোমাদের নিয়ে এরকম কথা বলে কেন? আমরা তখন ওদের বলেছি তোরা শুনিস না ওসব কথা আর এসব নিয়ে মেটদের কিছু না বলতে। আমাদের নিয়ে কোন কথা বললে সাধারণ বন্দিদের খুব মারধোর করা হত। সাধারণ বন্দিদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। যদিও তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো কারণও ছিল না। একটা রুটি নিয়ে বন্দিরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করত। সাধারণ বন্দিরা রুটি বা বাড়ি থেকে পাঠানো বিড়ি মেটদের দিলে তারা তাদের একটু সুযোগ-সুবিধা দিত। তাই বেশিরভাগ বন্দিদের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে তোষামোদ করার একটা প্রবণতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মেয়াদি বন্দিদের মেট্রন কিছু বলতে পারত না কারণ তাদের সঙ্গে সরাসরি রাষ্ট্রের সম্পর্ক। সাধারণত নকশাল বন্দিদের অত্যাচার করত জেল কর্তৃপক্ষ। তবে অনেক সময় মেটদের দিয়েও অত্যাচার করা হয়েছে। একবার মেটদের দিয়ে আমাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করা হয়েছিল, তখন কমরেড রীতার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল মেটরা। মেট্রনরা তাদের সুবিধার জন্য বন্দিদের ধীরে ধীরে এভাবে অত্যাচারী বানিয়ে তুলত। কিন্তু রোজ রোজ মারধর করতে পারত না আমাদের উপর। যেটা সবসময় সাধারণ বন্দিদের উপর করা হত। যেদিন নকশাল মেয়েদের উপর অত্যাচার হয়েছে সেদিনই মেটদের উদ্দেশ্যে কল্পনা আমাদের একটি মেয়ে একটি উলের কাঁটাকে বন্দুকের মত ধরে ভয় দেখিয়েছিল। এজন্য আমাদের ওয়ার্ড সার্চ করা হয়েছিল। কিন্তু এরপর থেকে মেটরা আমাদের একটু ভয় পেত। প্রেসিডেন্সি জেলে সাজাপ্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা ছিল বেশি, তাই সেখানে অত্যাচারও বেশি হত। হুগলী ও বর্ধমান জেলে শারীরিক নির্যাতনের পরিমাণ কম ছিল। হুগলী জেলে একবার খুনের কেসে আসামী হয়ে নাসিমা নামে একটি মেয়ে এসেছিল, সে নাকি তার স্বামী ও শাশুড়িকে খুন করেছিল। কিন্তু তাকে দেখে সে রকম মনে হত না। যদিও বিচারে তার যাবজ্জীবন সাজা হয়েছিল। তারপর প্রেসিডেন্সিতে

তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। নাসিমা যাবার পর আমি প্রেসিডেন্সিতে চিঠি পাঠিয়েছিলাম যে আমাদের এখান থেকে নাসিমা নামে একটি মেয়ে যাচ্ছে, তোরা ওকে একটু দেখিস। এর উত্তরে প্রেসিডেন্সি থেকে জানিয়েছিল যে মেয়েটি ধীরে ধীরে অন্যান্যদের মত নিশ্চয়ই একদিন অত্যাচারী হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে আমি প্রেসিডেন্সিতে গিয়ে নাসিমার অত্যাচারী স্বভাব প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আমাদের প্রত্যেক সপ্তাহে জেলের মধ্যে সুবিধা-অসুবিধার কথা জানার জন্য সুপার ও জেলার পরিদর্শন করতে আসত। জেলার, সুপারদের সঙ্গে কখনো সাধারণ বন্দিদের কোনো কথা হত না। বন্দিদের হয়ে মেটরা সব কথা বলে দিত। পাগলবাড়িতে যাওয়ার আগেও মেটরা তাদের সব কথা জানিয়ে দিত। এরপর নকশাল ওয়ার্ডে এলে আমরা নিজেদের কথা বলার পাশাপাশি সাধারণ বন্দিদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানিয়েছি। তখন জেল কর্তৃপক্ষ জানতে চাইত যে আমরা কীভাবে জানতে পেরেছি? তখন আমরা বলতাম কোর্টে যাবার পথে তাদেরকে আমরা দেখেছি। এছাড়া রাতে তাদের চিৎকার শুনে, কান্নার আওয়াজ শুনে আমাদের ঘুম হয় না। জেল কর্তৃপক্ষ সবকিছু জানার পরও কোনো বিশেষ লাভ হত না বন্দিদের। সাধারণ বন্দিদের কখনোই কেস কোর্টে উঠত না। যদি কখনো কখনো কারোর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ত তখন জানি না কীকারণে তারা কোর্ট থেকে ফিরত না। মাসিরা (ওয়ার্ডার) আমাদের বলত যে কোর্টে আত্মীয় এসে বাড়িতে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা খুব ভালো করে জানতাম যে তাদের কী পরিণতি! হুগলী জেলে করুণা নামে একটা মেয়ে ও তার বাচ্চা ছিল। জেলে আসার পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তুমি জেলে কেন? তার উত্তরে মেয়েটি বলেছিল তোমাদের মত এত ভালো কাজ করিনি আমরা। একদিন মেয়েটি আমাদের বলেছিল যে একটি বাড়িতে সে কাজ করত। সেই বাড়ির বাবুর চোখ পড়েছিল মেয়েটির উপর। এটা বুঝতে পারার পর বাড়ির লোককে জানাবে বলেছিল। তখন বাবুটি তাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল মেরে ফেলবে। ওই বাড়িতে কাজ করাকালীন কিছু দিন পর মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি বাবুকে বলেছিল এর জন্য তুমি দায়ী।

তখন ওই বাবু ও তার বাড়ির লোক বালা চুরির কেসে তাকে জেলে পাঠিয়ে দেয়। এমনকি তার স্বামী নষ্ট মেয়ে বলে তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে ঐ বাচ্চাটি ধীরে ধীরে জেলের মধ্যে বড় হতে থাকে। আমি বাচ্চাটিকে ভালোবেসে সত্যকাম নামে ডাকতাম। মেয়েটি জেলের মধ্যে থেকে বাচ্চাটিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মতো সুস্থ জীবন ধারণের স্বপ্ন দেখত।

অনেক ক্ষেত্রে জেলের সাধারণ ওয়ার্ডাররা আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। যেদিন জেলের মেটরা আমাদের মেরেছিল, সেদিন এক ওয়ার্ডার মাসি আমাদের বাঁচিয়েছিল। জেলের মধ্যে আগুন জ্বালানোর কোনো নিয়ম ছিল না। বাড়ি থেকে ইন্টারভিউ হলে বেশি করে চিড়ে, গুড় দিতে বলতাম। ওইটুকু জিনিস দিয়ে জেলের মধ্যে আমরা অনেক ভালো ভালো রান্না করতাম। কিন্তু কী করে করতাম সেটা উহ্যই থাক। নকশাল ওয়ার্ডে আমি এবং আরো তিনজন ডায়েট পেতাম। আমার গ্যাস্ট্রিক ছিল। ডায়েটে আমরা বাটার, দুধ, পাউরুটি পেতাম। সেই বাটার দিয়ে আমরা চিড়ে ভাজতাম। তরকারির মধ্যে থেকে সবজি ও আলু আলাদা করে বের করে ধুয়ে নিতাম। সপ্তাহে একদিন আমাদের মাছ দিত। সেই মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে পরে বড়া বানিয়ে খেতাম। রান্নার জন্য আমাদের মধ্যে থেকে দুজনকে কমিউনের দায়িত্ব দেওয়া হত। সেই দুজন কমিউন ছাড়া বাকীরা কেউ জানতে পারত না বিকেলে কী খাবার দেওয়া হবে। একবার শীতকালে আমি আর রাজশ্রী কমিউনের দায়িত্বে ছিলাম। তখন আমরা বিকেলে পাটিসাপটা তৈরি করেছিলাম। ডায়েটে পাওয়া পাউরুটিকে চটকে আটা মাখানোর মত করেছিলাম। তারপর দুধ থেকে ছানা তৈরি করে সেটাকে ক্ষীরের মত বানানো হল। এরপর বাটার দিয়ে ভেজে ভিতরে ক্ষীরের পুর দিতাম। এইভাবে আমরা পাটিসাপটা তৈরি করে খাইয়েছিলাম। আমাদের বৌমা (জয়শ্রী ভট্টাচার্য রুবী তাকে আমরা সবাই বৌমা বলতাম) সে আমাদের গোকুল পিঠে খাইয়েছিল।

জেলের মধ্যে ছেলেদের সঙ্গে আমাদের সরাসরি কোনো যোগাযোগ ছিল না। তবে আমরা জেলের মধ্যে রাজনীতি এবং সাধারণ বন্দিদের কথা বেশি ভাবতাম। আমাদের মধ্যে জেলে কেউ

ডিভিশন নেয়নি। ছেলেদের মধ্যে থেকে কিছুজন ডিভিশন নিয়েছিল। ডিভিশন নিলে একটু বেশি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, যেমন- খবরের কাগজ পড়তে দেওয়া, ভালো খাবার খেতে দেওয়া এবং বন্ধু ও কমরেডদের সঙ্গে ইন্টারভিউ করতে দেওয়া ইত্যাদি। আমরা সাধারণ বন্দিদের থেকে আলাদা হয়ে যাব, তাই কেউ ডিভিশন নিইনি। সাধারণ বন্দিরা তো ভালো খেতে পেত না। কারণ তাদের কোন ইন্টারভিউ হত না। আমাদের ইন্টারভিউ হলে বাড়ি থেকে খাবার পাঠিয়ে দিত। জেলের মধ্যে আমরা নিজেদের মতো পড়াশোনা, গান (গণসংগীত) ইত্যাদি নিয়ে থাকতাম। ছেলেদের সঙ্গে রাজনৈতিক কথাবার্তা নিয়ে আলোচনার মাধ্যম ছিল চিঠি। কোর্টে বা ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার সময় এই মাধ্যম বজায় থাকত। ছেলেরা চিঠিতে লিখে জানাত যে তারা কী প্রোগ্রাম নিচ্ছে, কী অ্যাকশন নিচ্ছে এবং বাইরে আন্দোলনের অভিমুখ কীরকম? ইত্যাদি। এছাড়া জেলে নিজেদের মধ্যে যেসব তার্কিক বিষয়গুলো আলোচনা হত, তা তারা চিঠি লিখে জানিয়ে দিত। পার্টির নিজেদের ভাগ হয়ে যাবার খবর এবং কারা কোন পার্টির পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলছেন সেগুলো জানতে পারতাম। একবার কানু সান্যালের একটা দলিল ছেলেদের থেকে আমরা পেয়েছিলাম। অন্য জেলের অ্যাকশনের কথা আমরা জানতে পারতাম ছেলেদের দেওয়া চিঠির মাধ্যমে। বাইরে থেকে কোন তথ্য এলে ছেলেরা আমাদের মতামত, সিদ্ধান্তের কথা জানতে চাইত। চিঠি পাওয়া মাত্র আমরা নিজেরা মিলে আলোচনায় বসে পড়তাম এবং মতামত বিনিময় করতাম। ছেলেরা জেলে থাকাকালীন বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, যেটা আমাদের মেয়েদের মধ্যে ঘটেনি। আমাদের মধ্যে একটা ধারা এসেছিল- প্রো লিন ও অ্যান্টি লিন। লতিকা, অর্চনা- এরা ছিল আন্টি লিন (লিন পিয়াও পন্থী নয়)। আমরা পরবর্তীকালে মহাদেব মুখার্জির নেতৃত্বকে অস্বীকার করেছিলাম। আমি, বৌমা মহাদেব মুখার্জির কাছাকাছি থেকে কাজ করেছি। জেলের মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা বেশি ছিল সেই তুলনায় আমাদের সংখ্যা অনেক কম। আমরা কখনই আদর্শ থেকে বেরিয়ে যায়নি। জেলে বসে আমরা চারু মজুমদারের সংগঠনকেই সমর্থন

করেছি। এই সংগঠনের অভিমুখ কতটা ঠিক ছিল বা ভুল ছিল সেগুলো বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বিচার করলেও সেই সময়ে এসব নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা করিনি। আমি আদিবাসীদের মধ্যে থেকে গ্রামে কাজ করেছি। শহরের শ্রমিকদের অর্থাৎ মেহনতী মানুষের মধ্যে থেকে কাজ করেছি। কোনো কিছু পরিবর্তনের জন্য আমরা সব সময় একটা অ্যাকশনের কথা ভাবতাম। মূর্তি ভাঙা নিয়ে কমরেড সরোজ দত্ত তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লষণ করেছেন। পরবর্তীকালে আমরা মূর্তি ভাঙার প্রসঙ্গে কিছু ভুল স্বীকার করেছিলাম। পরবর্তীকালে আরও মনে হয়েছে যে গণআন্দোলন করা খুব জরুরি ছিল। এরপর ধীরে ধীরে পার্টি ভেঙে যায় এবং কর্মীরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে চারু মজুমদারের সংগঠন এবং প্রো লিন ও অ্যান্টি লিন প্রশ্নে পার্টির সংগঠনকে অনেকখানি ভেঙে দেয়। আমরা ছিলাম প্রো লিন অর্থাৎ লিন পিয়াও পন্থী। জেলের মধ্যে আমরা রাজনৈতিক বিষয়ে অনেক নাটক করেছি। জেল থেকে পাওয়া কাপড় থেকে আমরা নাটকের পোশাক বানিয়েছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে অনেক উদ্ভাবনী ক্ষমতার জন্ম হয়েছিল। সেই সময়ে পার্টির যারা ফুলটাইমার হিসেবে কাজ করত তাদের একটা করে নাম পার্টি থেকে দেওয়া হত। পার্টি থেকে আমার নাম দিয়েছিল জয়া।

বর্তমানে জেল সংশোধনাগারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু জেলের ভেতরে পরিকাঠামোগত কোনো উন্নত ব্যবস্থা আজও হয়নি। বর্তমানে নারীবাদী স্বর সমাজের কাছে বহু আলোচিত ও বহুচর্চিত একটা বিষয়। সাতের দশকে নারী বিষয়ক প্রশ্ন সেইভাবে আসেনি। সেদিনের নকশালবাড়ি আন্দোলন বর্তমানে নানা আন্দোলনের অভিমুখকে নির্দিষ্ট করেছে, যেমন- পরিবেশ আন্দোলন, নারী আন্দোলন ইত্যাদি। তাই যে কোনো আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে নকশালবাড়ি আন্দোলনের একটা সদর্থক ভূমিকা আছে। আমি সব জায়গায় বলি যে সবচেয়ে ভালো বয়সে (যৌবনে) আমি সবচেয়ে ভালো কাজটা (নকশালবাড়ি আন্দোলনের অংশগ্রহণ) করেছি। এজন্য আমি নিজেকে নকশাল বলে গর্ব অনুভব করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ৯ এপ্রিল, ২০১৯

সময় : বিকাল ৫ টায়

স্মৃতিকথন : সন্তোষ রাণা

নকশাল আন্দোলন একটা সামাজিক ও বৈপ্লবিক আন্দোলন। এটা দেশের যে সামাজিক বাস্তবতা তার উপরে নির্ভর করে গড়ে ওঠে। সেই সময় মানুষের মনে নানা বিষয়ে ক্ষোভ ও বিক্ষোভের জন্ম হয়। এই ক্ষোভ-বিক্ষোভের নানা উপাদান গুলো কখনো না কখনো সংগ্রামের জন্ম দেয় এবং তার মধ্যে থেকেই সমাজটা পাল্টে যায়। এটাই পৃথিবীর সকল দেশের প্রায় কমবেশি ইতিহাস। আমরা যখন নকশালবাড়ির নাম করে কাজ করতে যাই গোপীবল্লভপুর থেকে সেখানে গিয়ে কৃষকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখলাম যে এই সমাজটা শোষণমূলক। যারা উৎপাদক তাদের পেটে ভাত জোটে না। কিন্তু জমিদার জোতদারা সবকিছু ভোগ করে। ফলে উৎপাদকের হাতে কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। এসব দেখে মনে হল যে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। যারা জমি চাষ করবে তাদেরকে কিছু কিছু জমি দিতে হবে। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এটা ছিল চীন বিপ্লবের মডেল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল ভারতীয় বিপ্লবটা চীন বিপ্লবের পথ ধরেই এগোবে। হাজার হাজার কৃষক যে যা পারে লাঠি, তীর, ধনুক, টাঙ্গি প্রভৃতি চিরায়ত হাতিয়ার নিয়ে স্থানীয় কর্তৃত্বের ক্ষমতার জায়গাগুলোকে ভেঙে ফেলতে শুরু করল। এরকম একটা বিপ্লব আমরা চোখের সামনে দেখতে পেলাম। এতদিন যে বিস্ময় আমাদের চোখে ধরা পড়েনি, আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে করতে সেই বিষয় সম্পর্কে তখন সম্যক ধারণা লাভ করলাম। গ্রামে যাবার সময় চারু মজুমদার বলেছিলেন যে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের গৃহে নির্ভয়ে থাকবে। দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক বলতে তিনি বলেছিলেন যারা মজুর খাটা শ্রমিক অর্থাৎ ভূমিহীন শ্রমিকও মজুর খাটে, দরিদ্র কৃষকও মজুর খাটে। গরিব কৃষকদের মজুর খাটা ছাড়াও নিজের জমি বা হাল-লাঙল কিছু থাকে আর ভূমিহীনের সেটা থাকে না। সেই সংকল্প মাথায় নিয়ে আমরা গ্রামে চলে গেলাম। পরে পুরো বিষয়টা জেলে বসে বিশ্লেষণ করেছি- যখন অনেক বড় বড় নেতা ধরা পড়ে গেল এবং আন্দোলনটা বিরাট ধাক্কা খেল। জেলে গিয়ে চিন্তাভাবনার পরিসরটা আরো

পাওয়া গেল এবং তার পাশাপাশি অনেক মানুষের একসাথে থাকার সুযোগ ঘটল। প্রায় ২০০-২৫০ মানুষ ধরা পড়ে যায় তখন। এছাড়া যারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল তারা অনেকেই ধরা পড়ে গিয়ে জেলের ভেতর আন্দোলনের গতিপথ সম্পর্কে আলোচনার বিস্তৃত পরিসর পাওয়া গেল। তখন মনে প্রশ্ন হল কেন আন্দোলনের পথটা এরকম হল? আমি বললাম দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের ঘরে যাওয়ার কথা হল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা গিয়ে পৌঁছালাম একটা মল্লক্ষত্রিয় গ্রামে বা বাগ্দী গ্রামে বা সাঁওতাল গ্রামে। সেই গ্রামগুলো ছিল গরীব শ্রেণিভুক্ত। বীরভূম বা বর্ধমান জেলার অনেক গ্রাম আছে যেখানে সদগোপ্রা হল প্রধান জাতি। অর্থাৎ সেই গ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী জাতি সদগোপ্রা, যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত। নকশাল আন্দোলনের বড় নেতা ছিলেন বীরেন ঘোষ ও তার বোন বীণা ঘোষ। এই ঘোষ পদবীরা হল গোয়ালা জাতি বা সদগোপ্ জাতি। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা খেতমজুর খাটতে যায় না। অল্পস্বল্প জমি- জায়গা তাদের থাকে এবং পেশাগত কাজ বা অন্যান্য কাজ কিছু করে। এই সমস্ত মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে আমরা গিয়েছি কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে সেইরকম সাড়া পাইনি। যেরকম সাড়া আমরা পেয়েছি বাগ্দী, ডোম, বাউরী, মাল, সাঁওতাল অর্থাৎ এককথায় আদিবাসী ও তপশিলি জাতির মধ্যে। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা যেভাবে একত্রিত হচ্ছে সেখান থেকে কোনোরকম কোনো খবর বাইরে বের হয় না। আমাকে একবার সাপে কামড়াল বাঁ পায়ে, তখন আমি সাঁওতাল এলাকায় ছিলাম। সাতদিন আমাকে সেখানে থাকতে হল। গোটা এলাকার মানুষের মধ্যে জানাজানি হল। তারপর ওষুধ পত্র দিয়ে সাত দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেলাম। পরে আমি যখন ১৯৭২ সালে ধরা পড়লাম, তখন মেদিনীপুর জেলার গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আমাকে বলেছিলেন যে যখন আপনাকে সাপে কেটেছিল সেই খবরটা আমরা পেয়েছিলাম ছ'মাস পরে। সুতরাং সেই সম্প্রদায়ের মানুষের নিজেদের মধ্যে একটা দুর্গ তৈরি করার প্রবণতা ছিল। এই যে বিশিষ্টতা, যেটা ভারতীয় সমাজের একটা বিশিষ্টতা; এটা চিনা সমাজে ছিল না এটা ভিয়েতনামেও ছিল না। এই যে ব্যবস্থা জাতি

ব্যবস্থা, বর্ণ ব্যবস্থা- যেখানে কোনও একজন ব্যক্তি শ্রেণি বিভাজনে, শ্রম বিভাজনের কোন ভূমিকায় থেকে অংশ গ্রহণ করবে এবং উৎপন্ন অংশ সে কতটা পাবে, কি পাবে না- সেটা কীভাবে নির্ধারিত হবে? সেই সব দিনগুলোকে যখন লেখালেখির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি তখন আমি আমার গ্রাম ধরমপুরকে নতুন ভাবে দেখেছি। তখন আমি বাস্তব চোখে দেখেছি যে কি রকম বিচার-আচার ছিল? বাগ্দি পাড়ার লোকেরা কতটা সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত? তেলিরা কতটা ভোগ করত? উচ্চবিত্ত শ্রেণি, নিম্নবিত্ত শ্রেণি- এই যে গোটা ভারত জুড়ে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা ছিল, তা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম দিক। এটা ভারত ছাড়া অন্য কোথাও নেই। ভারতের মতো সমাজ ব্যবস্থা কিছু নেপালে আছে, সেখানেও একই রকমের সমাজ ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়ায় বা অন্য কোথাও এরকম জাতি ব্যবস্থা আর নেই। ফলে Revolution দিয়ে Transformation সব জায়গায় একই রকম ভাবে হবে- এটা তো হতে পারে না। তাই নতুন ভাবে এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। যখন ১৯৪৭ সালের দেশ স্বাধীন হচ্ছে, তখন গোটা দেশজুড়ে একই সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জন করছে এবং মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ গণতন্ত্র প্রচারের একটা সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। এজন্য হয়তো পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। মানুষের কথা অনুযায়ী গণতন্ত্রের একটা প্রসার ঘটেছে। SC,ST- দের মধ্যেও একটা প্রসার ঘটেছে। এসব নানান বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিছু লোক, যে নতুন ভাবে Indian Condition অনুযায়ী এই আন্দোলনকে পুনর্সংজ্ঞায়িত করতে হবে। পুরনো বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে নতুন করে সম্পর্কের সীমা নির্দেশ করতে হবে। এইগুলো হল নতুন চিন্তা ভাবনার জায়গা। তাই বলে এটা ঠিক নয় যে আগের সব কিছু ভুল করেছিলাম। আমরা যে ধারণাটা নিয়ে গিয়েছিলাম, সেই ধারণার সঙ্গে ভারতীয় সমাজের বাস্তবতার কিছু মিল ছিল, কিছু মিল ছিল না। যেসব জায়গায় মিল ছিল না, সেই সব জায়গা গুলোকে নতুন করে ভাববার পরিসর খোঁজা হয়েছে। সেই চেষ্টা অনেকে এখনও করে চলছে।

জেলের জীবন হলো অন্য দুনিয়া। সেটা একটা অন্য সোসাইটি। জেলে গিয়ে লক্ষ করি সেখানকার বেশিরভাগ মানুষ তপশিলি জাতি ভুক্ত, আদিবাসী সম্প্রদায়ের। এটা যখন চোখে পড়ল তখন মনে হল এরা তো সমাজে এত জনসংখ্যায় নেই, তাহলে জেলের ভেতরে এত বেশি মানুষ কেন? জেলের মধ্যে ওরাই সব কেন? পরে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি বুঝলাম যে এই সমাজে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার আছে, ভোটের অধিকার আছে- কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার সবাই সমান ভাবে ভোগ করে না। কত লোককে জেলে দেখেছি যারা অন্য কারোর জন্য অপরাধী হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে দু'মাস সাজা হবে কিন্তু দেখা যায় তারা দু'বছর জেল খাটছে, কেউ তাদের জামিন করে না। এমনকি জামিন করার টাকা তাদেরও নেই। যাদের যাবজ্জীবন সাজা হয় তাদেরকে জেলের ভাষায় 'ডাইমলি' বলে। এই 'ডাইমলি' শব্দটা কোথা থেকে এসেছে প্রথমে তা বুঝতে পারিনি। পরে আমি খুঁজতে গিয়ে পেয়েছি 'ডায়মলি' শব্দটি এসেছে 'Damned for Life' থেকে। আর ওরাই জেলের 'মেট পাহারা' হত। 'মেট পাহারা' বলতে যারা জেলকে পরিচালনা করত। বিচারাধীন বন্দিদের জেলে কোন স্থান ছিল না। তাদেরকে খাটানোর কোন আইন ছিল না। কিন্তু তার সত্ত্বেও জেলব্যবস্থা তাদেরকে খাটাত। তারা খাটলে হয়তো এক মুঠো ভাত পাবে, এক মুঠো (১২ টা) বিড়ি পাবে। এক মুঠো বিড়ি (১২ টা) ছিল জেলের মুদ্রা। এখন জেলব্যবস্থার মধ্যে টাকা- পয়সার প্রচলন হয়েছে। এছাড়া জেলের মধ্যে Store- এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে পয়সার বিনিময়ে বন্দিরা ভালো-মন্দ খাবার কিনে খেতে পারে। তখন জেলে ছিল এক বাটি মাংস সমান দু'বাটি বিড়ি।তারা এক গ্লাস দুধের জন্য ডাক্তারের কাছ থেকে ডায়েট লিখিয়ে নিতে হত। ১৯৬৮ সালে যখন প্রথম জেলে যাই তখন জেল ছিল খোলামেলা। পরে যখন ১৯৭৮ সালে জেলে যাই তখন অনেক নিয়ম তৈরি হয়ে যায়। জেলের মধ্যে আমাদের একটা আলাদা ওয়ার্ড ছিল। ফলে জেলের মধ্যে আরেকটা জেল তৈরি হল। সব নকশাল বন্দিরা সেখানে থাকত। বন্দি অবস্থায় জেলকোডে প্রাপ্য খাবার বুঝে নিতে

গিয়ে দেখি বন্দিদের জন্য যে খাবার বরাদ্দ করা হয় তা পাওয়া যায় না; কারণ সেগুলো চুরি করে নিত ওয়ার্ডাররা। তখন আমরা প্রতিবাদ জানিয়ে বড় 'চৌকা' অর্থাৎ রান্নাঘরের ব্যবস্থা করলাম কিন্তু চৌকায় আমাদের যেতে দেওয়া হত না কারণ তারা মনে করত আমরা পালিয়ে যাব। সেই হিসেবে আমাদের ওয়ার্ডের লাগোয়া রান্নাঘরের ব্যবস্থা হয়। পরবর্তীকালে আমাদের ডায়েট অনুযায়ী যা খাবার বরাদ্দ হত সেগুলো আমরা খেতে পারতাম না। সেই চাল-ডাল সেপাইদের মধ্যে বিলিয়ে দিতাম। জেলের মধ্যে আমরা অনেক সংগ্রাম করেছি, যেমন অনশন করেছি- সেটা নিজেদের দাবি নিয়েও করেছি আবার জেলের দাবি নিয়ে, জল নিয়ে করেছি। ১৯৭৪ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে বড় ধরণের অনশন করেছিলাম- সেখানে আমাদের দাবি ছিল বই, রেডিও ইত্যাদি। রাষ্ট্রের কাজ ছিল যতটা সম্ভব সবকিছু থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায়, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ছিল আন্দোলনের প্রসার ঘটানো। আমি প্রথমবার জেলে ছিলাম এক বছর, ১৯৬৮-৬৯ সাল। দ্বিতীয় বার আমি জেলে গিয়েছিলাম ১৯৭২-৭৭ সাল। ১৯৭৭ সাল অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার তৈরি হবার পর আমি জেল থেকে বেরিয়ে আসি। বিধানসভা নির্বাচনে M.L.A. হবার পরেও প্রায় ১৫-২০ দিন আমি জেলে ছিলাম। ১৯৭৭ সালে পুজোর সময় বীরভূমে যাই সেখানে শান্তিনিকেতনে পোস্টঅফিসের সামনের মাঠে জনসভা করেছিলাম। সেখানে সামনের সারিতে ছিলেন শৈলেন মিশ্র, বীরেন ঘোষ, অলোক মুখার্জী। জেলের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ কখনোই ছিন্ন হয়ে যায় নি। মানুষের মধ্যে থেকে যদি কেউ ন্যায়ের পথে হাঁটে, নীতির পথে দৃঢ় থাকে তবে কিছু না কিছু লোকের সাহায্য সমাজের সর্বস্তর থেকে পাওয়া যাবে। মানুষ এই আদর্শের টানে সহযোগিতা করতে আসবে। মেদিনীপুর জেলে আমাদের প্রায় প্রতিদিন চিঠি যাতায়াত করত। এক্ষেত্রে জেলার, ডেপুটি জেলার আমাদের হয়ে ক্যুরিয়ার হিসেবে কাজ করতেন। জেলকর্তৃপক্ষ দেখত যে এরা এত অত্যাচার সহ্য করেও মাথা নিচু করে না। এরা খেটে খাওয়া গরিব মানুষের পাশে কাজ করে- এসব দেখে তারা সহযোগিতা করতে আসত।

সমাজতন্ত্র নয়ের দশকের ধারণা। তার আগেও সমাজে নানা সংগ্রাম হয়েছে ধর্মীয় আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। যেখানে দমন থাকে, সেখানে প্রতিবাদ থাকে এবং প্রতিবাদের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক মানুষের স্বাভাবিক সমর্থনও থাকে। আমি মেদিনীপুর প্রেসিডেন্সি জেলে থাকাকালীন দেখেছি যে সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত, নিগৃহীত মানুষ জেলের ভেতরে আছে। নীতি ও আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার থাকলে কোন কিছুর প্রতি ভয় থাকে না। আজ পর্যন্ত যত রকমের সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস হল শ্রেণি-সংগ্রামের। এই শ্রেণি-সংগ্রাম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সামাজিক বিষয়ে, ধর্মীয় বিষয়ে, আর্থিক বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমি সক্রিয় রাজনীতির জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর *রাজনীতির এক জীবন* বইটি লিখেছি। আমি দেখেছি যে ভারতীয় সমাজে বারবার চলে আসা নৈতিকতার জন্য, ন্যায়ের জন্যে যে সংগ্রাম- সেই ধারাবাহিকতা থেকে এসেছে জাতীয় আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং নকশাল আন্দোলন। এই ধরনের মতবাদই সমাজকে এগিয়ে যেতে শেখায়, প্রশ্ন করতে শেখায়, প্রতিবাদ করতে শেখায়। আমি আমার বইটিতে ষাট-সত্তরের বাংলায় শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস কেমন ছিল সেটার একটা জীবন্ত ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৫ এপ্রিল, ২০১৯

সময় : সকাল ১০ টা

স্মৃতিকথন : শুভেন্দু দাশগুপ্ত

আমি জেলখানার ভেতরে ছিলাম না। আমি গ্রেপ্তার হইনি, পালিয়ে বেরিয়েছি। জেলখানার স্মৃতি যাঁদের মনে ছিল, তাঁরা অনেকেই মারা গেছেন। যেমন শ্যামল, জেলখানায় গান গাইত, কবিতা লিখত, নাটক করত। জেলখানার স্মৃতি লিখিত আকারে কয়েকটি বইতে আছে। বই পড়ার পাশাপাশি স্মৃতিকথা শোনাটাও দরকার। যারা সেই ভাবে বইয়ের পাতায় নিজেদের বন্দিজীবনের কথা লিখে রাখেন নি, সেই সব মানুষদের কাছে বসে তাদের স্মৃতি থেকে কিছু টুকরো টুকরো কথাগুলোকে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এরকম একজন মানুষ হলেন সৃজন সেন, যিনি জেলখানায় বসে ডায়েরি লিখেছেন, গান লিখেছেন, গান গেয়েছেন। এছাড়া কল্লোল দাশগুপ্ত জেলখানায় গান গেয়েছেন, নাটক করেছেন। তিনি নিজের জেলখানার স্মৃতিগুলোকে নিয়ে একটি বই লিখেছেন *কারাগার বধ্যভূমি ও স্মৃতিকথা।* জেলের মধ্যে যে হতাশা-যন্ত্রণা-কষ্ট ছিল তার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বন্দিরা নতুন জগৎ তৈরি করেছিলেন- ভাবনার জগৎ, সৃষ্টির জগৎ, স্বকীয়তার জগৎ, যা জেলস্মৃতিকথার অন্যতম বিশেষত্ব। ফলে জেলস্মৃতিগুলো হল আর একটি সৃষ্টির জায়গা। জেলখানায় আটকে রইলাম বলে আন্দোলনের বাইরে বেরিয়ে গেলাম বা আন্দোলন নিয়ে ভাবলাম না- এমন ধারণা ভিত্তিহীন। যে স্বপ্নগুলো আন্দোলনে থাকাকালীন দেখেছিলাম, জেলখানায় চলে গেলে তা হারিয়ে যাবে এমন নয়। জেলখানার ভেতরে গিয়ে মানুষের মধ্যে আলাদা একটা দৃষ্টি, একটা স্বপ্ন, একটা আদর্শ এবং একটা লড়াইয়ের প্রতি দায়বদ্ধতা আরও বেশি দৃঢ় হয়ে উঠল। জেলখানায় বসে আন্দোলনের গতিপথ নিয়ে কমরেডরা আরো বেশি করে চিন্তা করার পরিসর পায়, যেটা জেলের বাইরে সেই ভাবনার পরিসরের জায়গা প্রায় ছিল না। কারণ তারা একসঙ্গে অনেকজন অনেক সময় ধরে থাকতে পারতেন না। জেলের ভেতরে নিজেদের মধ্যে অনেক তাত্ত্বিক বিষয়ে আলোচনা হত। সেই তার্কিক বিষয় থেকে নানা তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। জেলের ভেতরে কমরেডদের আলোচনায় তাত্ত্বিক বিষয় থেকে নানা বিতর্কের সৃষ্টি

হয়েছিল আন্দোলনের গতিপথটা নিয়ে। আন্দোলন যে আদর্শ নিয়ে গড়ে উঠেছিল, সেগুলো কি ঠিক ছিল?- প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে কমরেডদের মধ্যে কোথাও পুনর্ভাবনার পরিসর তৈরি হয়েছিল জেলের অভ্যন্তরে। যেটা হয়তো জেলের বাইরে থাকাকালীন কমরেডদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। জেলের ভেতরে বসে থেকে অনেকগুলো তাত্ত্বিক বিষয় এসেছিল। তাত্ত্বিক বিষয় বলতে- যা করছি সেটা ঠিক করছি কিনা? নতুন কিছু করার আছে কিনা?- এইসব। জেলখানার ভেতরে যে তাত্ত্বিক বিষয়ের জন্ম হয়েছিল তা আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে সাহায্য করেছিল। আন্দোলনকারীরা জেলখানার মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তর্ক, লেখা ইত্যাদি আদান-প্রদান করা হত। পাশাপাশি লেখাগুলো জেলের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। এই তাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে জেলের ভাষায় 'থিসিস' বলা হত। এছাড়া ছিল- জেলখানায় বসে চিঠি লেখা। এই চিঠিগুলো বাড়ির লোক বা বন্ধুদেরকে দেওয়া নয়, সেগুলো দেওয়া হত কমরেডদের। জেলখানায় বসে আন্দোলনের মূল্যায়ন। জেলের সহানুভূতিশীল কর্মীদের সাহায্যে জেলের ভেতরের লেখাগুলো বাইরে বেরিয়ে যেত। এই জেলকর্মীরা মনে করতেন এইসব মানুষদের লড়াইটা সঠিক। 'রাজনৈতিক বন্দি'- এই শব্দটি তখন আলাদা একটা অর্থ তৈরি করেছিল। এই আন্দোলনকর্মীরা কোন ব্যক্তিগত অন্যায়ের কারণে জেলের ভেতরে আসেননি, বরং মানুষের মঙ্গল কামনায় এসেছেন- এই পার্থক্যটা জেলকর্মীরা বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে জেলের ভেতরের লেখাগুলো বাইরে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে জেলকর্মীদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। নকশালবাড়ি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যতগুলো প্রশ্ন উঠেছে, নকশালবাড়ি আন্দোলন পূর্ববর্তীকালে সম্ভবত: ততগুলো প্রশ্ন ওঠেনি। নকশালবাড়ি আন্দোলনের আগে যারা জেলখানায় ছিলেন, সেখানে আন্দোলনকে ঘিরে প্রশ্নের কথা খুব একটা জানা যায় না, সেই তুলনায় নকশালবাড়ি আন্দোলনকে নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন হয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ২৩ মার্চ, ২০১৯

সময় : সকাল ১১.১৭ মিনিট

স্মৃতিকথন : কল্লোল দাশগুপ্ত

আমার দুটি স্মৃতিকথা বই আকারে লেখা আছে। একটা হল *কারাগার বধ্যভূমি ও স্মৃতিকথকতা* আর অন্যটি হল *তক্কোগুলি চরিতাবলী ও আখ্যানসমূহ*। প্রথম বইটিতে আমি বিশদভাবে সাতের দশককে বর্ণনা করেছি। আমি দুবার ধরা পড়েছি। একবার ১৯৭০ সালে তখন আমার বয়স পনের বছর। আর একবার ১৯৭৬ সালে, সেটা জরুরি অবস্থার সময়। দুটো দু'ধরনের অভিজ্ঞতা। প্রথমবারের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে প্রথমবার বলে রোমাঞ্চকর। যখন আমার পনের বছর বয়স তখন কার্যত প্রথম আমি অনাথ। এর আগে পর্যন্ত একটা পনের বছরের ছেলে সেই সময়ের বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, প্রচুর ঘেরাটোপের মধ্যে থাকত। আমরা সন্ধে ছ'টার পরে বাইরে থাকতাম না। বাইরে থাকলে বাড়ি থেকে খুব বকুনি খেতাম। তখনকার মানুষের মনে ধারণা ছিল যে সন্ধ্যের পর যারা বাড়ির বাইরে থাকে তারা খারাপ ছেলে। ফলে আমাদের খেলাধুলো, আড্ডা- সবই ছ'টার মধ্যে শেষ হয়ে যেত। এই প্রথম ধরা পড়ার পর বুঝলাম আমার অভিভাবক বলে কেউ নেই। একটা শত্রুভাবাপন্ন দুনিয়াতে আমি ঢুকে পড়েছি, যেখানে পুলিশরা নিশ্চয় আমার বন্ধু নয়, আর যারা আমার সঙ্গে লকআপে আছে তারা বন্ধুও নয়, শত্রুও নয়। এই প্রথম আমি চোর, টিকিট-ব্ল্যাকার- এদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকছি। আমি তো সাধারণত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক পরিবারের ছেলে। ফলে এদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ কোনদিনই আমার হয়নি। তখন রাজনীতিটা আমি যেভাবে করতাম, সেটা ভীষণই রোমান্টিক এবং রাজনীতি বিষয়টা স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে তর্কাতর্কির পর্যায়েই ছিল মাত্র। আমি সেন্ট লরেন্সে পড়তাম। সেটাও একটু ভালো ছেলেদের স্কুল। সেখানে তখন তো একটা সি.পি.আই(এম-এল)- এর লাইন ছিল। বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় যে যত পড়ে, সে তত মূর্খ। ফলে পড়াশোনা ছেড়ে বেরিয়ে এসো। এরপর স্কুল জ্বালিয়ে দাও। স্কুলে অ্যাকশন করতে হবে। কিন্তু আমাদের স্কুল তো ভালো ছেলেদের স্কুল- তাই কে বোম বাঁধবে? আর কে বোম মারবে? তাই আমাদের স্কুলে অ্যাকশন হয় না।

দেশপ্রাণ স্কুলে অ্যাকশন হয়, রাজেন্দ্র প্রসাদ স্কুলে অ্যাকশন হয়। এজন্য আমরা খুব মরমে মরে থাকতাম। ফলে আমরা খুব কম বিপ্লবী হয়ে গেলাম। তখনও পর্যন্ত আমার রাজনীতি ওই অবধি। এরপরে সেন্ট লরেন্সে দু'বার বোমা পড়ে। দ্বিতীয়বার যখন বোমা পড়ে তখন ঘটনাক্রমে সেই বোমা কাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে ধরা পড়েন যিনি, তিনি সেই সময়কার শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্যের ছেলে। যদিও তিনি বোমা মারেননি, কিন্তু তিনি আকস্মিকভাবে ধরা পড়েন। তখন পুলিশ এটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করে। আমাদের স্কুলে একটি ছাত্রকে ধরে। সে কী কারণে ধরা পড়ে জানিনা। সে দুপাতা ভর্তি নাম দিয়েছিল, যারা তার সাথে জড়িত। তাতে প্রথম নামটি ছিল আমার। তাতে পুলিশের ধারণা হয়েছিল যে আমি নেতা গোছের ছেলে। তারপর একদিন বাড়িতে এসে ধরে নিয়ে গেল আমাকে। আমাকে টালিগঞ্জ থানার স্পেশাল ব্রাঞ্চ ধরেছিল। কিন্তু আমাকে রাখা হল টালিগঞ্জ থানাতে বা লোকাল থানাতে। তবে কেন পুলিশ আমাকে ধরে ছিল- সেটা আমি নিজেই জানিনা। তারপর পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল যে সেন্ট লরেন্সে কে বোমা মেরেছে? কোথায় বোমা রাখি? কোথায় পাইপ-গান রাখি? কিন্তু আমি তো কিছুই জানতাম না। তার ফলে প্রচণ্ড মারছিলাম খেয়েছিলাম সেবার। পনের বছর বয়সী মধ্যবিত্ত বাঙালি কিশোর বাড়িতে বাবার হাতে চড় খেয়েছি বটে, তবে নির্মমভাবে মার খাওয়া- এটা আমার জীবনে প্রথম মার খাওয়া। কেন জানিনা প্রথম মারটা পড়ার পর খুব অপমানিত লাগছিল। তারা বিশ্রী গালাগালি করছিল এবং প্রচন্ড মারছিল। সেই অপমান থেকে অদ্ভুত একটা জেদ কাজ করল। ওরা যত পারে মারুক তাতে আমার ভীষণ লাগছে কিন্তু আমি একবারও তা প্রকাশ করব না। ফলে ওরা আমার শরীরকে মারছে এবং আমার আত্মাকেও অপমান করছে। এটা কোথাও আমার জেদকে বাড়িয়ে তুলেছিল এবং আমি দাঁতে ঠোঁট চেপে পড়েছিলাম। তাতে মারটাও বেশি খেয়েছিলাম। তারপর সাত দিন পর আমাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও তখন কোর্টে তোলা হত না কাউকে। গাড়ির মধ্যে বসে থাকতাম। আলিপুর আদালতে আমার মামলা ওঠে। কিছুটা খুনের মামলা- এরকম ছিল।

গোটাটাই মিথ্যে মামলা। তখন তাই-ই হত। তবুও আমাকে আলিপুর স্পেশাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আলিপুর স্পেশাল জেল বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে গেছে। সেখানে আর জেলখানা নেই। আমার যেহেতু আঠারো বছরের কম বয়স, তাই আমাকে জুভেনাইল সেলে রাখা হয়েছিল। জুভেনাইল ফাইলে আমার মত অল্পবয়সীরা থাকত আর একজন মাত্র বেশি বয়সে থাকতেন। তার নাম পশুপতি। এই পশুপতি আমাকে নানা রকম গল্প বলত। তার মধ্যে কোন রাজনীতি ছিল না। এর মধ্যে একটা জেল পালানোর চেষ্টা হয়। সেই ঘটনায় লাল্টু, পল্টু, পরিতোষ, দেবু- এরা জড়িত ছিল। তার মধ্যে এরা সকলেই ধরা পড়ে যায়, কেউ পালাতে পারেনি। পরিতোষকে আমাদের চোখের সামনে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। আমরা তখন দোতালায় ছিলাম। যতক্ষণ না পরিতোষের দেহটা একটা মাংসপিণ্ড হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ ধরে তাকে পেটানো হয়েছিল। আর গোটা জেল জুড়ে প্রচন্ড স্লোগান উঠছিল- পরিতোষের হত্যার বদলা চায়, পরিতোষের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুর বদলা চায় ইত্যাদি। আমি একবার মারধর খাওয়ার হাত থেকে খুব জোর বেঁচে গিয়েছিলাম। কারণ ওই সময়টাতে কারারক্ষীরা ওয়ার্ডে ঢুকে ঢুকে বেছে বেছে নকশাল বন্দিদের বার করে প্রচন্ড মেরেছিল। আমি ওই পশুপতির জন্য সে বার বেঁচে গিয়েছিলাম। পশুপতি আমাকে একটা কম্বলের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। যদিও আমি নকশাল হিসাবেই তখন ধরা পড়েছিলাম। যদিও আমি রাজনীতি বলতে নেহাতই তর্কাতর্কি ছাড়া আর কিছুই করিনি। এই জেলবাস এক অর্থে আমাকে বড় হতে সাহায্য করেছে, ফলে আমি অনেক পরিণত হয়েছি। পশুপতির কাছ থেকে নানান ঘটনা শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। আর তার মধ্যে একটা ঘটনা হল- তাদের কাছে খবর এসেছে চিনির বস্তা নিয়ে ওয়াগন আসছে। তারা খবর পেয়ে ওয়াগন থেকে চিনির বস্তা নামিয়েও ফেলেছে। কিন্তু সম্ভবত খবর পৌঁছে গিয়েছিল পুলিশের কাছে। তাই রেলওয়ে পুলিশ এসে ওদের তাড়া করে। ওরা চিনির বস্তা ফেলে পালিয়ে যায়। পশুপতি বলছে তখন আমার খুব খারাপ অবস্থা। বাড়িতে কোনো টাকা-পয়সা নেই। রেশন আনা

পয়সাও নেই। ওই চিনির বস্তা যদি মহাজনের কাছে দিতে পারতাম তাহলে রেশন আনার পয়সাটা থাকত। তারা তিনটি চিনির বস্তা রেল লাইনের পাশে থাক দিয়ে রেখেছে। আর তাতে হেলান দিয়ে পুলিশ বসে আছে। তখন পশুপতি, পশুপতির বউ আর পশুপতির বোন- এরা তিনজন বুকে হেঁটে রেল লাইনের ধার দিয়ে উঠে পেছন থেকে ব্লেড দিয়ে বস্তাকে কেটে সেখানে আঙুল দিয়ে দিয়ে চিনি বের করে শাড়ি, লুঙ্গির কোঁচড়ে করে এনে এক জায়গায় ফেলছে। এই ভাবে তারা ভেবেছিল চিনি বের করে নেবে, কিন্তু এই ভাবে তিন বস্তা চিনি সরানো যায় না। ফলে কিছুক্ষণ পর পশুপতি বুঝতে পারে যে এতে কিছু কাজ হবে না। পশুপতি আমাকে বুঝিয়ে বলল আমার তখন একটা Idea এল। সম্ভবত যখন আর্কিডিমিস 'ইউরেকা' বলেছিলেন, তখন তাঁর মুখটা যেরকম হয়েছিল পশুপতির মুখটাও সেরকম হয়েছিল। সে তার বউ আর বোনকে বলেছিল- 'ওরা তিনজন আর তোরা দুজন। সামনে গিয়ে ধর, ব্রিজের তলায় নিয়ে গিয়ে খানিকটা সময় নিয়ে খেলিয়ে আয়।' এরপর পশুপতি তিনটি চিনির বস্তা সরিয়ে ফেলেছিল। এটা পশুপতি আমাকে আবিষ্কারের গল্পের মত করে বলেছিল। তার এতে কোনোরকম অপরাধবোধ ছিল না। আমি তখন পনের বছরের কিশোরের। তাই ব্রিজের তলায় নিয়ে গিয়ে খেলার মানে কী- সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। এই কথাগুলো আমার পনের বছরের মাথায় মুগুরের মত এসে পড়েছিল। কারন আমার কাছে, আমাদের বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কাছে যে সতীত্ব, মেয়েদের সম্মান, তার উপরে বোন, তার উপরে বউ- এটা আমি ভাবতে পারিনি। এটা আমার কাছে অসম্ভব ব্যাপার। মানুষ গরিব হয়, গরীব হলে খুব কষ্টে থাকে- আমি এটুকুই জানতাম। কিন্তু দারিদ্র কী- এটা আমাকে পশুপতি বুঝিয়েছিল। যেখানে প্রতিটি দিন দাঁত-নখ বের করে লড়াই করতে হয়, সেখানে সতীত্বের কোন অর্থ নেই। এই ভাবে আমি ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছি।

যদি রাজনৈতিক আদর্শের কথা বলতে হয়, তাহলে আমার বাবা ১৯৬৭ সাল থেকে মার্কসবাদে দীক্ষিত। বাবা ICI-এ কাজ করত। তখনকার দিনে বিদেশি কোম্পানি। তিনি

ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমার বাড়িতে মার্কসবাদের বইপত্র ছিল, সেগুলো আমি পড়তাম। তাই একটা মার্কসবাদী আদর্শ মাথার মধ্যে ছিল। আমি কেন নকশাল হলাম? কারণ আমার মনে হয়েছিল বিপ্লব করতে হবে এবং এরা বিপ্লবী। বিপ্লব কি?- আমি জানি না। আমি জানি বিপ্লব মানে একটা দারুণ বন্দুক-পিস্তল নিয়ে মারপিট হবে। তারপরে এইসব পুলিশরা মরে যাবে। আমাদের রাজত্ব কায়েম হবে। আমাদের পুলিশ থাকবে। আমরা আমাদের মত করে একটা ব্যবস্থা কায়েম করব। যেখানে কারোর কোনো দুঃখ থাকবে না। এর থেকে বেশি পার্টির চিন্তা করার মত বয়স আমার ছিল না। জেলে যাবার পর থেকে আমার উপরে মারধোর, জেলে পরিতোষের মারা যাওয়া, জেলের ওই অমানবিক পরিবেশ প্রভৃতি ঘটনা আমার ওই আদর্শকে আরও দৃঢ় করেছে। জেলে সকালবেলার খাবার ছিল ছোলা সেদ্ধ, যে ছোলাগুলোর অধিকাংশই ছিল পোকায় কাটা এবং পোকা ভর্তি। আমরা ঠাট্টা করে বলতাম প্রোটিন। দুপুরবেলায় ভাত, ডাল এবং সামান্য তরকারি দেওয়া হত। ডালটা পাতলা চায়ের মত রঙ ছিল। থালা বলে যেটা ছিল আমাদের কাছে সেটা অ্যালুমিনিয়ামের অদ্ভুত এক পাত্র। সেটা কার ছিল জানি না। তবে সেটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে একটা কড়াই বানিয়ে ফেলেছিল। তার মধ্যেই খেতাম। জেলে স্নান দু-তিন দিনের বেশি করেছি বলে মনে পড়ে না। প্রাতঃকৃত্য করতে যাবার যে ব্যবস্থা ছিল সেটা রৌরব নরকের মত। যেগুলো সবই আমার কাছে অচেনা ভয়ঙ্কর এক জগৎ। ফলে এই অবস্থাটা তো ভালো নয়, বিপ্লব হলে এগুলো পাল্টাবে- এই বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাওয়া আর এটাই আদর্শ। এর পরে আমাকে জামিন দেয়া হল। সেই সময় পার্টির নির্দেশ ছিল জামিন নেবে না। জামিন নেওয়াটা কাপুরুষের কাজ। জেল ভেঙ্গে বেরোবে আর না হলে গণসঙ্গী এসে তোমাদের মুক্তি দেবে। কিন্তু আমি জামিন নিয়ে বেরোলাম। তার কারণ আমি এত ছোট ছিলাম যে আমার জামিন পাওয়াটা খবর হয়ে গিয়েছিল। তখন আমার জেলখানার দাদারা আমাকে বলল তুই জামিন নিয়ে নে। তুই অনেক ছোট, তাই তুই এখান থেকে বেরিয়ে পড়। আমার জামিনের শর্ত ছিল আমি

তিন বছর কলকাতায় থাকতে পারব না। তারপর আমি খড়্গপুরে মেসোমশাই-এর কাছে থেকে হিজলী হাই স্কুলে ভর্তি হলাম একাদশ শ্রেণিতে। ওখান থেকে আমি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করি। আবারও আমি বাবা মায়ের বন্দির বাইরে চলে যাই। I.I.T. ক্যাম্পাসে একটা প্রিভেলিং সংস্কৃতি হচ্ছে অর্থাৎ আমেরিকান সংস্কৃতির একটা অনুকরণ বিশেষ। আমেরিকান সংস্কৃতি মানে সব সময় সেটা মেনস্ট্রিম সংস্কৃতি। তখন Flower Children Movement আমেরিকাতে প্রবল হয়ে উঠেছিল। সেই সময় কলকাতায় থাকতে আমি খুব বেশি সাহিত্য পড়িনি। I.I.T. খড়্গপুরে গিয়ে লাইব্রেরীতে আমি গোগ্রাসে বই পড়তাম। সেই সময়ে সুনীল গাঙ্গুলীর নীলরোহিত ছদ্মনামে লেখাগুলো প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেখানে নিলুর সাথে নিজেকে মেলাতে পারতাম। নিলু ছিল খুব ভবঘুরে গোছের। মেসোমশাই-এর বইয়ের ভালো সংগ্রহ ছিল। সেখানে অদ্ভুত দুই ধরনের বই ছিল যেগুলো একটা অন্যের বিপরীত। একটা ছিল মুজতবা আলীর আর অন্যটা মার্কসের দার্শনিক লেখা। মুজতবা আলী ছিলেন একেবারে অ্যান্টি-কমিউনিস্ট। ওই সময়ের বিপরীত ধরনের পড়া আমার মনকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে- যা কিছু তোমার মতের বিপক্ষে তার মধ্যে সব কিছুই খারাপ নয়, তার মধ্যে ভালো কিছু থাকে। সেই সময় চারু মজুমদার ধরা পড়েছেন এবং মারা যাচ্ছেন। সি.পি.আই(এম-এল) পার্টি ভাগ হয়ে যাচ্ছে। অসীম চ্যাটার্জী, সন্তোষ রাণা, সত্যনারায়ন সিনহা প্রমুখেরা বেরিয়ে আসছেন পার্টি থেকে চারু মজুমদারের সমালোচনা করে। তাঁরা বলছেন যে তাঁরা ভুল করেছেন। আমিও আমার জীবন দিয়ে কিছুটা উপলব্ধি করেছিলাম যে কোথাও একটা গন্ডগোল হচ্ছে। যেভাবে বিপ্লব হওয়ার কথা ছিল সেভাবে হচ্ছে না। এই সময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাওয়াটা আমাদের কাছে বিরাট ব্যাপার, কারণ আমরা তো এখানে সশস্ত্র বিপ্লব গড়ে তুলতে পারিনি কিন্তু বাংলাদেশ তো অস্ত্রের জোরে স্বাধীন হল। ফলে এই সময় একটা মনোবল যেন বাড়ল। এর মাঝখানে ভিয়েতনামের যুদ্ধে ভিয়েতনাম জিতেছে। এটা বুঝলাম যে আদর্শ বলতে যে পথে আমি বা আমরা

হাঁটছিলাম, সেই পথটাতে গন্ডগোল আছে। এর পর তিন বছর পর আমি কলকাতায় ফিরে আসি। তারপর সাউথ সিটি কলেজে ভর্তি হই অ্যাকাউন্ট্যান্সি অনার্স নিয়ে। সেখানে ঘটনাচক্রে আমরা পাঁচজন একটা বেঞ্চে বসতাম। এই পাঁচজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হল। এর মধ্যে একজন APDR (Association for the Protection of Democratic Rights)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে এরা রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবি তুলেছে কোনো রঙ না দেখে। আমি এ প্রসঙ্গে বন্ধুকে বলেছিলাম যে এইভাবে চিৎকার করলেই কি ওরা বন্দিদের ছেড়ে দেবে? এরপর বন্ধুটি আমাকে বলল তোকেও তো একদিন বন্দি থাকতে হয়েছিল। তাহলে তোর কি এটা নৈতিক কর্তব্য নয় যারা বন্দিরা আছে তাদের হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করা। আমি এই যুক্তিকে সেদিন খন্ডন করতে পারিনি। তারপর আমি APDR- এ গেলাম। তখন APDR- এর প্রথম যুগ ছিল। আমরা মিছিল করতাম, সেটাকে বলতাম 'সেন্ট্রাল র‍্যাগিং'। আমাদের প্রথম ADPR- এর মিছিল হয়েছিল সাত জনের। সেটা এক লাইনের মিছিল ছিল। মিছিল তো সাধারণত দু লাইনের হয়। সাতজনের মিছিলে প্রথমে তিনটে পুলিশ এবং শেষে তিনটে পুলিশ ছিল। রাজ্য তখনও পর্যন্ত এই কর্মসূচিগুলো গ্রহন করতে পারছে না, কারণ রাজ্য জানে যে এইগুলো নকশাল। সেই সময়ে অনেকে এ বিষয়ে সমর্থন করেছেন এই কারণে যে এরা কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থে বিপ্লব করেনি, রাজনৈতিক কারণে করেছে। তাই তাদের সুযোগ পাওয়ার অধিকার আছে। ফলে পুলিশও এই বিপ্লবের গতিবিধি বুঝতে পারছে না। ১৯৭২-১৯৭৭ সালে তখন কংগ্রেসের সিদ্ধার্থ রায়ের মন্ত্রীসভা। APDR একটা বন্দিমুক্তি সংগঠন এবং সর্বোপরি মানবাধিকার সংগঠন বলা যায়। ফলত আমরা সি.পি.এম- এর সঙ্গে যুক্ত বন্দিদের মুক্তি চাইছি আবার যারা কংগ্রেস করছে তাদেরও মুক্তি চাইছি। এর ফলে গোটা Paradigm টা বদলে যাচ্ছে। ওই সময়ে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসিরা সি.পি.এম- এর ছেলেপুলেদের পাড়া ছাড়া করেছে, বাড়ি ছাড়া করছে। তারাও আমাদের মত ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন সি.পি.এমের ছেলেদের সঙ্গে কথা হচ্ছে তখন

আমরা বলছি যে তোমাদের সাথে আমাদের মারপিট হওয়ার কথা নয় এবং তারাও স্বীকার করছে যে তাদেরও ভুল হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে রেলওয়ে স্ট্রাইক। ফলে সারা ভারত স্তব্ধ। তারপর থেকে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে। জরুরি অবস্থার সময় APDR- কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। ফলে নিষিদ্ধ সংগঠনের মেম্বার হিসেবে আমি ১৯৭৬ সালে আবার ধরা পড়লাম। এবারেও স্পেশাল ব্রাঞ্চ ধরেছিল আমাদের। তারা যখন আমাদের মারধরের হুমকি দিচ্ছে তখন আমরাও পাল্টা হুমকি দিচ্ছি। ফলে পুলিশ এই প্রথম নকশালদের মুখে হুমকির কথা শুনল। পুলিশ কাস্টডিতে নিয়ে গিয়ে পেটাতে পারে না- এটা বেআইনি, এটা বোঝার ক্ষমতা তত দিনে হয়েছিল। তখন আমরা পুলিশের কাছে Human Rights Commission- এর কথা বলেছিলাম। এবারে জেলের চিত্রটা ছিল অন্যরকম। আমরা 'সাত খাতা' নামে প্রেসিডেন্সি জেলে থাকতাম। সেখানে ১৭, ১৮, ১৯, ২০- এই চারটি ওয়ার্ডে থাকতাম। একটি ওয়ার্ডে আটজন করে থাকতাম। সেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা, খাওয়া-দাওয়ার মান আগের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। জরুরী অবস্থা চলায় জেলে থাকার জন্য মনে মনে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। আমরা জেলে মার্কসবাদ নিয়ে অনেক পড়াশোনা করতাম। যদিও বইগুলো জেলে সেন্সরড হয়ে আমাদের কাছে আসত। মাও-সে-তুঙ-এর লেখা বই পাস হয়ে যেত কিন্তু ক্যালকুলাসের বই সেন্সরড হয়ে আসত না। কারণ অঙ্ক কষে আমরা যদি জেল ভেঙে পালিয়ে যায়। এরপর জরুরি অবস্থা উঠে গেল এবং আমরা মুক্তি পেলাম। জেল থেকে বেরিয়েও আমাদের মধ্যে মার্কসবাদের আস্থা আছে, তাই মনে করতাম যে বিপ্লব হবে। তবে পথটা একেবারেই অন্যরকম। আমরা যেহেতু মানবাধিকারের কথা বলছি তাই বিপ্লবী হিসেবে বিরোধীদের অধিকার কেড়ে নিতে পারি না- এই প্রশ্নটা তখন মনের মধ্যে তৈরি হচ্ছে। তখন আস্তে আস্তে গান্ধী চর্চা শুরু হল। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে শিখেছি। ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা তুলে দিয়ে ইলেকশন ঘোষণা করলেন। তার আগে পর্যন্ত নকশালরা ইলেকশনের বয়কট নীতিকে বিশ্বাস করতেন। আমি ও

আমার বন্ধু দেবাশীষ মনে করতাম যে এই ইলেকশনে অংশগ্রহণ করা উচিত। ইলেকশনে অংশগ্রহণ করা নিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে 'সাতখাতা'-য় একটা বিতর্ক হয়েছিল। তাতে আমরা বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলাম যে নির্বাচনে যাব কি যাব না- এটা নীতিগত প্রশ্ন নয়, কৌশলগত প্রশ্ন। কানু সান্যাল তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। কানু সান্যালের বেশ কিছু অনুগামী প্রেসিডেন্সিতে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কোর্ট পড়ার দিনে আমাদের যুক্তি নিয়ে অনুগামীরা কানু সান্যালের সঙ্গে আলোচনা করে এবং কানু সান্যালও সেই যুক্তিকে সমর্থন করেন। এই প্রথম নকশালরা বলল যে স্বৈরতন্ত্রকে যদি সরাতে হয় তাহলে ইলেকশন হবে একটা হাতিয়ার। দ্বিতীয় জেলবাস আমাকে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে, ভাবতে শিখিয়েছে এবং সেই সঙ্গে APDR- এর অভিজ্ঞতাও কাজে লেগেছে। দ্বিতীয়বার জেলবাসে তর্ক করার পরিসরটা আরও বেশি করে তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল আর তো ধরা পড়ব না, তাই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ করে গিয়েছিল জেল। জেলের ভেতরে ও বাইরে তত্ত্বের বিতর্কগুলো সমান্তরালভাবে চলত। জেলে মহিলাদের অবস্থা অর্থাৎ যারা আমাদের রাজনীতি করত তাদের সঙ্গে যে অরাজনৈতিক মহিলা বন্দিরা থাকতেন তাঁদের অবস্থান নিয়ে একটা লেখা তাঁরা পাচার করেন। সেই লেখাটা ছাপা হয় 'দর্পণ' নামে একটি পত্রিকায়। এটা একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা। 'দর্পণ' পত্রিকায় নানা ধরনের বিতর্ক আসত। এই পত্রিকাটাই মীনাক্ষী সেনের *জেলের ভেতর জেল*-এর বীজতলা। কিছুটা জয়ার *হন্যমান*- এই নিয়ে লেখা। জেল থেকে নানা ধরনের বিতর্কিত তথ্যগুলো তখন 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সেটা ভাইজ্যাক জেল থেকে কানু সান্যালরা পাঠিয়েছিলেন More On Naxalbari নামে। কানু সান্যালরা নকশালবাড়ির অভ্যুত্থান নিয়ে কীভাবে ভাবছেন এবং সেটা চারু মজুমদারের চিন্তা থেকে কতটা আলাদা- এই বিষয় নিয়ে 'ফ্রন্টিয়ার'-এ বের হয়েছিল এবং প্রচন্ড বিতর্কের করেছিল। ফলে একদিকে কানু সান্যালের লাইন এবং অন্যদিকে চারু মজুমদারের লাইন ভাগ হয়ে যায়। এর মধ্যে আবার উপদল তৈরি হয়েছিল

এবং তাতে নানা বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল- এই খবরটা জেল থেকে পাচার হয়ে যায়। তারপর ভাইজ্যাক জেল থেকে কানু সান্যাল ও সৌরেন বসু দুজনে মিলে এই বিষয়ে ডকুমেন্ট তৈরি করেছিলেন। ইলেকশনে নকশালরা অংশগ্রহণ করবে এই বিষয় নিয়ে সান্ধ্য টেলিগ্রাফে বিতর্কটা বেরিয়ে ছিল। সেখানে কানু সান্যালদের বিবৃতির একটা ছবি দেওয়া ছিল। আজকের দিনে যারা ইলেকশনের বিরোধিতা করেছে তারা পক্ষান্তরে স্বৈরতন্ত্রের হাতকে শক্তিশালী করছে। এটা প্রাচার হয়েছিল জ্যোতির্ময় দত্তের হাত দিয়ে এবং হাম দি বে-র মাধ্যমে টেলিগ্রাফে খবরটা বেরিয়েছিল। জ্যোতির্ময় দত্ত তখন বন্দি ছিলেন। কলকাতা পত্রিকার অ্যান্টি জরুরি অবস্থার সুবাদে তিনি ধরা পড়েছিলেন। হাম দি বে ছিলেন তখন টেলিগ্রাফের একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক। আসলে নকশাল আন্দোলন শুধু একটা আন্দোলন নয়। নকশাল আন্দোলন বলতে যে জিনিসটা তুলে ধরা হয়েছিল, তার বাইরেও প্রচুর নকশাল আন্দোলন ছিল। আমরা তার মধ্যেই ছিলাম। আমরা সেই সময়ে প্রচুর সাংস্কৃতিক মিছিল বের করতাম। ১৯৭৪ সালের ১ মে, ২০ জুন, ২০ জুলাই মিছিল বের হয়েছিল। ২০ জুলাই- এর মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং তাতে একজন মারা যায়। নকশাল আন্দোলনের আদর্শ একটা নয়। নকশাল আন্দোলনের ‘নকশালদের’ আদর্শ থেকে বেরিয়েছে আমরা। কারণ সেই আদর্শ গণআন্দোলন, গণসংগঠনে বিশ্বাস করত না। তারা মনে করত গেরিলা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ সংঘটিত হবে। আমরা মনে করছি সশস্ত্র বিপ্লবই রাস্তা কিন্তু তার মধ্যে কোথাও বিকল্প চিন্তা তৈরি হচ্ছে, যা ‘নকশাল’ চিন্তার বাইরে। তাদের বিরোধিতা করে মানুষকে আরও বেশি বেশি করে সংগঠিত করতে হবে- এটা আমাদের লক্ষ্য।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ৮ এপ্রিল, ২০১৯

সময় : সন্ধ্যা ৭ টা

স্মৃতিকথন : আজিজুল হক

প্রচলিত একটা কথা আছে বদ্ধভূমি জেলখানা একঝাঁক গুলি একজন শক্তিধর বিপ্লবীর পরীক্ষাগার। স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হলে এই তিনটে একজনের অদৃষ্টে প্রভাব পড়ে। আমি যখন জেল থেকে দুমড়ে-মুচড়ে বেরলাম তখন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে একজন মহিলা আমার কাছে এলেন। তিনি এসে আমাকে দেখে এতই আপ্লুত হলেন যে আমার কেসটা ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেন। আমি তখন হাসতে হাসতে বলেছিলাম, ম্যাডাম তোমার কি মনে হয় যে আমাকে কেউ ফুসলিয়ে এই পথে নিয়ে গিয়েছিল। আমার যা বয়স তাতে কি আমি মজা করার জন্য ওই পথে গিয়েছিলাম। যাঁরা জেলে ধরা পরার বলে যে জেল কর্তৃপক্ষ অত্যাচার করেছে, আমি সেই কথার বিরোধিতা করি। আমি যখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করব, তখন সেই রাষ্ট্র তা মেনে নেবে না। আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম আমি যদি এদেরকে পেতাম, তবে এর থেকেও আরও বেশি মারতাম। এসব কথা শুনে সেই মহিলা খুব বিরক্ত হয়েছিলেন।

আমি যখন জেলে গেলাম তখন জেলের ভেতরে দেখলাম অন্যান্য বামপন্থী তথাকথিত যারা মূলধারার পার্টি তারাও বিভিন্ন কারণে জেলের ভেতরে আছে। ফলে জেলখানা এমন এক জায়গায় পরিণত হয়েছিল যেখানে ১২০০ লোকের জায়গায় ৩৫০০ মানুষ বন্দি হয়ে আছে। এই পরিস্থিতিতে জেলের মধ্যে সাধারণ কয়েদিদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। জেলের সাধারণ বন্দিদের একটা কম্বল, একটা থালা, একটা মগ, একটা চাদর ইত্যাদি দেওয়ার কথা। কিন্তু তখন জেলের পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে তিনজনকে মিলে একটা কম্বল দেওয়া যায়নি, পাঁচজনের জন্য একটা থালা দেওয়া যায়নি। এই সময় জেলের মধ্য জলের ব্যবস্থাও ছিল। প্রতিদিন সকালে এক ঘন্টার জন্য জল পাওয়া গেলে একজনের জন্য তিনটে এক লিটারের বড় বাটিতে তিন বাটি জল পাওয়া যেত। সেই সময় সেপাই দাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিত। ইতিমধ্যে সেই সময় দেশে ভয়ংকর হাহাকার শুরু হয়েছে। সেই হাহাকারের প্রভাব জেলে ভেতরেও দেখা গিয়েছিল। তখন গ্রাম থেকে বেশিরভাগ মানুষ ধরা পড়ে জেলে ভেতরে আসে। তাদের দুপুরে জেলে বরাদ্দ খাবার হিসেবে পাওয়া যেত ৫৭ গ্রাম চালের ভাত, সেই সঙ্গে রাঙা আলু সেদ্ধ করে দেওয়া হত। সকাল বেলার খাবার ছিল পোকা ভর্তি ছোলা সেদ্ধ। মাঝে মাঝে কোনোদিন সকালে চিঁড়ে দুধ পাওয়া যেত। রাতের খাবার ছিল তিনটে রুটি ও পাতলা কালো ডাল। এই পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকেরই কম বেশি ছিল। এই সময় জলের বাইরে অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা জেলের ভেতরে প্রবেশ করছে। তারা জেল ব্যবস্থার এই ঘেরাটোপের

মধ্যে প্রবেশ করে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারছে না। ফলে রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করে তারা জেল থেকে বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। এদেরকেই সি.পি.এম- রা 'কংশাল' বলত। জেলে আমরা যারা ছিলাম তাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল- ক্রিমিনাল, ডাইহার্ট এবং সাজাপ্রাপ্ত। তাদের একটা অংশ ছিল সুবিধাভোগী, এদের মধ্যে একদল ছিল অল্প কেসের আসামী এবং বেশিরভাগটা ছিল হাজতী অর্থাৎ যারা বিচারাধীন বন্দি। বিচারাধীন বন্দিদের দুটো ভাগ ছিল। একদল হল রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন ধারায় যারা অভিযুক্ত, আর একদল ছিল অসামাজিক কাজের ধারায় অভিযুক্ত। আমার প্রায় চার বছরের জেল খাটার অভিজ্ঞতা ছিল CPI ও CPIM- এর আমলে রাজনৈতিক বন্দি হিসাবে। আমি তখন ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে জেলে গেছি। আমি তখন বেশ নাম করা নেতাও ছিলাম। জেল অভিজ্ঞতায় জেলার, ডেপুটি জেলার, সুপার- এঁদের সাথে খুব পরিচয় হয়েছিল। এই পরিচিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সেই সময়ে জেলে আসা ছেলেগুলোকে আমাদের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম। প্রেসিডেন্সি জেলে 'সাত খাতা'য় পর পর তিনটে গরাদ ছিল। সেখানে আমরা ২০০-২৫০ জন একসঙ্গে থাকতাম। রাজনৈতিক বন্দি হিসাবে জেলে যাওয়ার পর জেল প্রশাসন তখন আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত। তারা ভাবত আমরা প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাব। কিন্তু সত্তর সালে ধরা পড়ার পর তারা বুঝতে পরল যে আমরা এরকম কিছুই হতে পারব না। ফলে তাদের আচরণের পরিবর্তন দেখা দিল। ইতিমধ্যে জেল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে ডিভিশনের কথা বলে। এর ফলে আমাদের মধ্যে থেকে একদল ডিভিশনের পক্ষপাতী হয়ে ওঠে। আমি জেলে ডিভিশন নিইনি। কারণ আমার মনে হয়েছে আমার সাথে যারা ধরা পড়েছে তারা ক্রিমিনাল হিসেবে গণ্য হবে আর আমি জেলে বাবু সেজে থাকব। সকরারের পলিসি হিসেবে ডিভিশন পরিচিত হয়েছিল কারণ তাদের লক্ষ্য ছিল আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা।

আমার জেলস্মৃতি হল বড় দুঃখের, বড় লাঞ্ছনার, বড় যন্ত্রণার। সারাজীবন ধরে ভালো কাজ করা বা ভালো কথা বলা সহজ ব্যাপার, কিন্তু একটা ধাক্কার পরে আদর্শের প্রতি অবিচল থাকা সহজ ব্যাপার নয়। সেই আদর্শটা হল শ্রেণিসংগ্রাম কখনও ভুলবে না। শত্রু কোনো পার্টি নয়, শত্রুর নাম শ্রেণি। স্বাভাবিকভাবেই এই আদর্শটা জেলখানায় আমাদেরকে প্রভাবিত করেছিল। তাই জেলখানায় আমরা জামিন, ডিভিশন, বন্ড কোনোকিছুই নিইনি। জেলের মধ্যে থেকে রাজনৈতিক কর্মসূচীকে সফল করার অনেক কথা ভেবেছি। প্রথমে মনে হয়েছে এই বন্দিত্বকে অস্বীকার করতে হবে। আমাদের এই কর্মসূচীর কথা শাসকের কানে চলে যাওয়ায় তারা আমাদের কিছু লোককে বেছে বেছে ডাণ্ডাবেড়ি পরাতে শুরু করল, যাতে আামদের শারীরিক কষ্টটা আরও বেশি হয়। ডাণ্ডাবেড়ির ওজন ছিল ১৫ কিলো যা বেআইনি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলে নকশালরা

নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এদের মধ্যে একদল আইনি পথ অর্থাৎ জামিন, বন্ড ইত্যাদির মাধ্যমে মুক্তি গ্রহন করল, আর একদল আইনি পথকে অস্বীকার করল। তাদের মতে আইন হল রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ। এছাড়া তারা আইনকে নিরপেক্ষ বলে মনে করত না। অভ্যুত্থানের সময় যারা জেলের মধ্যে প্রবেশ করে, তারা আমাদের শ্রেণিভুক্ত ছিল না। বেশিরভাগই ছিল তাদের ঘরের ছেলে। তাই তাদের নিজেদের সুবিধার্থে আইনকে নিরপেক্ষতা অর্জন করতে হয়েছিল। এই সম জেলে অনেকে শহীদ হয়েছেন। এই সময় বহরমপুর জেলে তিমির শহীদ হয়েছিল। এইসব ছেলেরা জেলখানার বেইজ্জতিকে মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা প্রতিবাদের পথে হেঁটে গিয়েছিল। এই সময় জেল থেকে বেরনোকে মূল স্ট্রাটেজি হিসেবে গ্রহন করা হল। সেটা আইনি কায়দায় নয়, জেল ভেঙে জেল থেকে বেরনো। এই প্রতিবাদের জন্যই বাংলাদেশের জেলখানাগুলো প্রায় বিদ্রোহের কেন্দ্র হয়ে উঠছিল। মেদিনীপুর জেলে ১৬ ডিসেম্বর আদিবাসী বন্দিদের অপমানের বিরুদ্ধে কমরেডরা বিদ্রোহ করে এবং তার ফলে তাদের উপর ব্যাপক অত্যাচার করা হয়। তখন জেলে ১৬ জন শহীদ হয়েছিলেন। সাধারণভাবে প্রতিটি অভ্যুত্থান বা বিদ্রোহের পরে মানুষগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। জেলের স্মৃতিগুলো প্রত্যেকের কাছে ঘৃণা আর ভালোবাসার অদ্ভুত এক মিশ্রণ। এক চোখে ঘৃণা আর এক চোখে ভালোবাসার মধ্যে এক অদ্ভুত আকুতি ছিল- যেটা তাদের পীড়নকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে। জেলকে বর্তমানে সংশোধনাগার বলা হয়। এই সংশোধনাগার গড়ে ওঠে নকশালপন্থীদের আন্দোলনের ফলে। সাধারণ বন্দিদের সুবিধার জন্য আমি সেই সময় বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলাম, যেমন- মুক্ত জেলের ব্যবস্থা, তাদের শিক্ষিত করে তোলা, তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক পাওয়া ইত্যাদি। এর জন্য জেলে আমি অনশন করেছিলাম। জেলখানায় অনশন ছিল এক ভয়ংকর বিপ্লবী অস্ত্র। সুতরাং নকশালপন্থীদের উপর অত্যাচারের ফলস্বরূপ বর্তমানে জেলের মানবী দিকটি গড়ে ওঠেছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ৯ এপ্রিল, ২০১৯

সময় : দুপুর ২টা